৮ জুলাই ২০০৭
প্রতিদিন
রোববার
মাউস ট্র্যাপ
সংবাদ প্রতিদিন এর সঙ্গে বিনামূল্যে

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

এক সময় বাঙালির ঘরে ঘরে রেশমী চুড়ি প্রচলন ছিল খুব - তবে সেই রেশমী চুড়ি **Concept** এর লোহা - নতুনত্ব তো বটেই, দেখতে **Smart** । মুখ নেই অনেকটা চুড়ির মতো। **Western outfit, Jeans** সবের সঙ্গে পরলেই মানিয়ে যাবে - বিশ্বসুন্দরীর এই নোয়ার প্রস্তুতকারক কলকাতার একমাত্র জুয়েলার অঞ্জলি জুয়েলার্স ।

অঞ্জলি জুয়েলার্স™

গোলপার্ক ঃ ২৮এ, গড়িয়াহাট রোড, কলকাতা-২৯, ফোন ঃ ২৪৪০ ১৭৯২ / ২৪৬০ ০৫৮১
সল্টলেক ঃ বি. ই. ১০১, কোয়ালিটি মোড়, কলকাতা - ৬৪, ফোন ঃ ২৩২১ ২০৫৭ / ২৭৮৬
সল্টলেক ঃ এইচ. এ. - ৩, সেক্টর - III, GD আইল্যান্ডের পাশে, কলকাতা- ৯৭, ফোন ঃ ২৩২১ ৮৩১০ / ১১
বেহালা ঃ ৫২২সি, ডায়মন্ডহারবার রোড (স্টেট ব্যাঙ্কের পাশে) কলকাতা - ৩৪, ফোন ঃ ২৪৪৫ ৫৭৮৪ / ৮৫
(নতুন শোরুম) "অঞ্জলি বাটী", শোভাবাজার ঃ ৩৮, অরবিন্দ সরণী, কলকাতা - ৭০০০০৫
(শোভাবাজার মেট্রো স্টেশনের পাশে) ফোনঃ ২৫৩৩ ৫৮৩২ / ৫৮৩৪
www.anjali.bz এছাড়া আমাদের আর কোন শো - রুম নেই
theadventure@mail.com

রোববার

৮ জুলাই ২০০৭

লেটারবক্স
পাঠকের পাতা ৪

ফার্স্ট পার্সন
ঋতুপর্ণ ঘোষ ৬

ভালো-বাসার বারান্দা
নবনীতা দেবসেন ৮

এবার মলাট

মাউস ট্র্যাপ
অনুব্রত চক্রবর্তী ১২
উইকিম্যাপিয়া
পীযূষ আশ ২০

রোববারের রামপ্রসাদী
আয় মন বেড়াতে যাবি
সুব্রত মুখোপাধ্যায় ২৪

বাংলার মুখ
পথের পাঁচালি
জয়া মিত্র ৩০

রোববারের মেগা
কলিকাতায় নবকুমার
সমরেশ মজুমদার ৩২

কমিকস
বাতিকবাবু
অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় ৩৬

সেন সলিউশনস
রাইমা সেন ৩৮

রান্নাঘরে রেস্তোরাঁ
গুপ্তা ব্রাদার্স-এর
আম কুলফি ৪০

টিম রোববার

অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়
অর্পিতা চৌধুরী
তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
নীলাঞ্জনা বসু
প্রসূন চক্রবর্তী
বর্ণিনী মৈত্র চক্রবর্তী
বিপুল গুহ
রিংকা চক্রবর্তী
শান্তনু দে
সন্দীপন মজুমদার
সুপ্রিয় দাস

সৌজন্য

শ্রীরূপা সরকার

সম্পাদক ঋতুপর্ণ ঘোষ

প্রতিদিন প্রকাশনী লিমিটেডের পক্ষে সৃঞ্জয় বোস কর্তৃক
বি এল পাব্লিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত।

সংবাদ প্রতিদিন এর সঙ্গে বিনামূল্যে

লে

লেটারবক্স

রাজার কবি, প্রজার কবি

২২ এপ্রিল রোববার-এ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবির লড়াই' শীর্ষক প্রচ্ছদকাহিনিটি অসাধারণ। ইতিহাসের পাতা থেকে তিনি যেভাবে প্লেটো, ওভিড, শেলি, জন মিলটন, লর্ড বায়রন, নেরুদা প্রমুখ প্রবাদপ্রতিম কবি ও দার্শনিকদের তুলে এনেছেন, রোববার-এর পাতায়—তা এককথায় অনবদ্য। এই ধরনের লেখা এক এবং একমাত্র রঞ্জনবাবুর পক্ষেই সম্ভব! ইতিহাসখ্যাত কবিকুলের ভাবনাকে যেভাবে নন্দীগ্রাম-উত্তরবঙ্গের ভাবনার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন—তা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে! রঞ্জনবাবুর লেখালেখির ধরণ সম্পর্কে মোটামুটি আমরা সবাই অবহিত। যে বিষয় নিয়েই তিনি লিখুন না কেন, তা অত্যন্ত যত্ন নিয়ে সিরিয়াসলি লেখেন। ভাষার বুনন এত জমাট যে, চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে তাঁর লেখা। রঞ্জনবাবু প্রত্যেক কবির ভাবনাকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন এবং স্পষ্ট বিভাজন রেখা সৃষ্টি করে তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন—কোন কবি কোন দলে। রঞ্জনবাবুর দিক-নির্দেশ এত স্পষ্ট যে, আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না, সুনীল সহ কোন কবিরা রাষ্ট্রের চোখে 'গুডবয়' আর জয় গোস্বামী সহ কোন কবিরা রাষ্ট্রের চোখে 'ব্যাডবয়'!

বিজন মজুমদার
ইছাপুর, উত্তর চব্বিশ পরগনা

প্রাঞ্জল বর্ণনা

মলাটে যদি থাকে 'কবির লড়াই' তবে তো রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাঞ্জল বর্ণনা পাবই, এটা প্রত্যাশিত। ২২ এপ্রিল রোববার সেই মুগ্ধতা দান করল। আর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তো এখন রাজকবি। অন্যদিকে জয় গোস্বামী হলেন, বাংলার নির্যাতিতদের প্রতিবাদী কবি। তিনি এখন ধুলো মাটি মাখা শোকার্ত বঙ্গের পাবলো নেরুদা। যদি তাঁর প্রতিবাদী মন না মরে থাকে, যদি এই আবেগ, এই কাতরতা শব্দ-অক্ষরে বেঁচে থাকে—তবে শহিদ মিছিলে উচ্চারিত হবে তাঁর কবিতা। তাঁর মৃত্যুর পর আগামী প্রজন্ম তাঁকে নিয়ে নিশ্চয়ই কবিতা লিখবেন। কারণ তিনি 'কবির লড়াই'-এর অনেক উপরে অবস্থান করছেন।

বিবেকানন্দ নস্কর
ফলতা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

সমৃদ্ধ করেছে কবিমন

২২ এপ্রিল-এর 'কবির লড়াই' এক অনবদ্য সংখ্যা। প্রশ্ন একটাই। অন্য দেশের দুঃখ দুর্দশা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়, অথচ নিজেদের দেশে যখন পাশবিক অত্যাচার হয়, তখন আমরা নির্বিকার থাকি কেন? সুন্দর সুন্দর কবিতার উদ্ধৃতিতে রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটি অসাধারণ তথ্য সমৃদ্ধ রচনা। আমাদের কবিমনকে সমৃদ্ধ করেছে। শেলির কথাটি আমিও বিশ্বাস করি— "Poets are the unacknowledged lagislators of the world". লোরকার মৃত্যুতে বেদনাহত মনকে আরও একবার প্রত্যক্ষ করলাম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কবির মৃত্যু'-তে। শঙ্খ ঘোষের প্রতিক্রিয়া স্বতস্ফূর্তভাবেই ধ্বনিত 'বহিরাগত' কবিতায়। আর জয় গোস্বামী তো অসাধারণ। সব মিলিয়ে প্রাসঙ্গিক ঘটনাপ্রবাহে, কবিতার কোলাজ সমস্ত ব্যাপারটাকে এক অন্যমাত্রা দিয়েছে।

সুদীপ কুমার চক্রবর্তী
হাওড়া

প্রাসঙ্গিক নিবন্ধ-কবিতা

২২ এপ্রিল রোববার-এর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত নিবন্ধ ও কবিতাগুলো খুবই প্রাসঙ্গিক। কিন্তু একটি বিষয়ে খুবই বিস্মিত এবং বিপন্নবোধ করছি।

নন্দীগ্রামে পুলিশের গুলিতে বহু মানুষের হতাহত হওয়ার ঘটনা খুবই নিন্দাজনক এবং মর্মান্তিক। কিন্তু ঘটনাটি নিয়ে এ রাজ্যের কবি, সাহিত্যিক, চিত্রকর, নাট্যশিল্পীরা যেভাবে যুযুধান দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পরস্পরের প্রতি বাক্যবাণ এবং শব্দাস্ত্র প্রয়োগ করছেন তা বোধকরি অধিকতর নিন্দাজনক এবং ভয়াবহ কেউই যে রাজনীতির বাইরে নয়—এই মত অত্যন্ত নির্মমভাবে সত্য। বোঝাই যাচ্ছে, এতদিন মুখ্যমন্ত্রীর পাশে থাকা অনেক সাহিত্যিক তাঁর চরম শত্রুই ছিলেন আর ছিলেন সুযোগের অপেক্ষায়। সুযোগ আসতেই নখ-দাঁত বের করে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। শিল্পায়ন বিষয়টি পুরোপুরি অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত এখন দেখছি, অনেকেই নিজেদেরকে অর্থনীতিবিদদের চেয়ে বড় অর্থনীতিবিদ বলে জাহির করছেন তাঁদের যদি ভিন্ন মত-ই ছিল তাহলে এতদিন প্রকাশ করেননি কেন? বিরোধী কোনও দলে যোগ দিয়ে সেই দলকে তো সমৃদ্ধ করতে পারতেন! তাতে মানুষ উপকৃত হত' গণতন্ত্রে ভারসাম্য বজায় থাকত! সন্দেহ নেই, পোড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা সুযোগটিকে অনেকেই সদ্ব্যবহার করবেন। জায়গা কখনও শূন্য থাকে না। জায়গা দখল করার মানুষের অভাব হবে না। তাই গান মেলার আসরও ফাঁকা থাকেনি। সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামও পূর্ণ হয়ে যায় সেখানে এক কবি আর এক কবিকে কটাক্ষ করতে ছাড়েন না। এক সাহিত্যিক আর এক সাহিত্যিককে উপহাস করেন। এই ধরনের কাদা ছোড়াছুড়ি, মনে প্রশ্ন জাগায়—সংস্কৃতিচর্চা করলেও নিজেরা চরিত্রে, কতটা সাংস্কৃতিক? কতটা সুরুচিসম্পন্ন? এবার হয়তো শুরু হবে ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে টানাটানি! সুতরাং, আমার অনুরোধ এবার থামুন। আপনারা ফিরে যান আপনাদের সৃষ্টির জগতে। বিষয়টি অর্থনীতিবিদদের উপরই ছেড়ে দিন। গুলি চালানোর ঘটনা মহামান্য আদালত দেখছেন, শিল্পায়ন বিষয়টা অর্থনীতিবিদদের দেখতে দিন।

পৃথ্বীশ সানা
কলকাতা-৮৪

বোধ ও বুদ্ধির সহাবস্থান

২২ এপ্রিল-এর 'ফার্স্ট পার্সন'-এ রোববার-এর মুখটা দেখলাম। এই মুখের দৃঢ়তা, স্পষ্টতা, স্বাভাবিকতার চাবুকের ঘায়ে বামশাসনের মুখোশটা খসে পড়েছে। যে বামেদের বিষাক্ত ধোঁয়ায় গ্রাস করেছে নন্দীগ্রামের নিষ্পাপ বাচ্চা ও ব্যাকুল মহিলাদের মুখগুলো। রোববার সেই অন্ধকার পৃথিবীর কারিগরদের দিকে উদ্যত মুষ্টি তুলে ধরে গভীর, নিঃশব্দ প্রশ্ন রেখেছে—'তোরা' কে? কলমের এই ধারের কাছে রাইফেল লজ্জা পেল কিনা, খুব জানতে ইচ্ছে করছে। বোঝা গেল, রোববার আর শুধু একদিনের নয়, প্রতিদিনের। শুধুই বই-এর পাতা নয়, মনের খাতাও। বোধ ও বুদ্ধির সহাবস্থান। লেখকের চেতনা ও পাঠকের চৈতন্যের যুগলবন্দি।

হীরালাল শীল
কলকাতা-১২

মনের পর্দায় মোমো

২২ এপ্রিল-এর রোববার-এ বর্ণিনী মৈত্র চক্রবর্তীর লেখা 'মোমো চিত্তে' পড়ে মোমোকে ঘিরে কিছু কথা মনে পড়ে গেছে। চাকরিসূত্রে গ্যাংটক থেকে সারা সিকিম—আমাকে চষে বেড়াতে হয়েছে বেশ কয়েকবছর। সর্বত্র দেখেছি, এই মোমোর উপস্থিতি। তবে সেখানে ভেজিটেবল মোমোই বেশি পাওয়া যেত। বড় বড় রেস্তোরাঁ ছাড়া অন্য কোথাও নন ভেজিটেবল মোমো দেখিনি খুব একটা। সমগ্র সিকিমে জলখাবার হিসাবে মোমোর স্থান এক নম্বর হলেও ক্ষেত্র বিশেষে মেন ফুডের জায়গাটাও মোমোর দখলে। দিনের পর দিন কাজের চাপের জন্য সময়মতো খেতে না পাওয়ায় সিকিমের যত্রতত্র চটজলদি খাবার হিসাবে মোমো আমাদের অভাব মিটিয়েছিল। তাছাড়া, এমনিতেও সুস্বাদু এবং সহজপাচ্য বলে মোমো সকলের কাছে খুব জনপ্রিয় খাবার। আজ রোববারের পাতায় 'মোমো চিত্তে' পড়ে মোমোর কথা নতুন করে মনে পড়ল। মোমোকে ঘিরে সিকিমের নানা স্থানের স্মৃতি হুড়মুড় করে এসে হানা দিল মনের পর্দায়। শুধু আমি কেন আমার মতো সিকিম ফেরত মানুষরা যারা মোমো খেতে, ভালবাসেন—রোববারের মাধ্যমে জানতে পারল কলকাতা শহরে মোমোর সন্ধান।

সমর বসু
চুঁচুড়া

ধারালো লেখা

২২ এপ্রিল-এর 'ফার্স্ট পার্সন' বহুদিন মনে থাকবে। কবিতা লিখলেই যে শুধু কবি হওয়া যায় না, লেখাটি পড়ে পাঠকের সহজেই বোঝা উচিত। এমনই একটি ধারালো লেখা পড়বার জন্য মুখিয়ে থাকি প্রতি রোববার। যার লেখক, ছুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ—সব লেখার ক্ষমতা রাখেন। রোববারের মলাটও সেরকমই—এক মলাটে অনেক কিছু। তাই রোববারকে আমার স্বপ্নপূরণ করার জন্য ধন্যবাদ।

'কবির মৃত্যু' শীর্ষক সুনীলদা'র লেখাটিও যেন জ্বলন্ত সূর্য! যার তাপে ২২-এর রোববারে আমি পুড়তে পুড়তে এই অঙ্গীকার লিখছি—

'শেষ নিশ্বাস পড়ার আগে কবির ঠোঁট একবার
নড়ে উঠলো কি উঠলো না
কেউ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করেনি'---

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আজকের পরে কেউ না কেউ ভ্রূক্ষেপ করবেনই। একজন হলেও করবেন।

শঙ্খশুভ্র দে বিশ্বাস
বনগাঁ, উত্তর চব্বিশ পরগনা

চিঠি পাঠাবার ঠিকানা :
লেটার বক্স, রোববার
সংবাদ প্রতিদিন
২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০০৭২
ই-মেল :
robbar.pratidin@gmail.com
ফ্যাক্স : 22127977

ফা
ফার্স্ট পার্সন

ঠিক যখন প্রায় বিশ্বাস করতে আরম্ভ করে ফেলেছি যে আমাদের মতো প্রগতিশীল সমাজে বোরখা জিনিসটা একটা সেকেলে পর্দা, কেবল পুরনো দিনের অভিনেত্রীরাই ব্যক্তিগত জীবনের গতিবিধিকে স্বচ্ছন্দ করার জন্যই এটা ব্যবহার করতেন, ঠিক সেই সময়ই বোমাটা ফাটাল প্রীতি জিন্টা।

প্রীতিকে আধুনিকা বলেই জানি। প্রীতি পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত, নিজের ব্যক্তিত্ব নিয়ে বিন্দুমাত্র আড়ষ্টতা নেই। সেই প্রীতিও নাকি বোরখা ব্যবহার করে ওর দৈনন্দিন জীবনে।

কারণগুলো মজারও বটে। আশ্চর্যও বটে।

প্রধান কারণ, প্রীতি যা বলল, যে বোরখা থাকলে বাইরে বেরোবার জন্য আলাদা করে তৈরি হতে হয় না সব সময়ে। বাড়ির টি শার্ট এবং শর্টস-এর ওপর বোরখা চড়িয়ে নিলেই বেশ একটা বাইরের পোশাক। এরপর, প্রয়োজনে অটোরিকশা করে যাতায়াত করলেও অসুবিধে নেই।

ভাবলে কেমন লাগে না! য়ে পোশাক আদতে সৃষ্টি হয়েছিল নারীর বন্দিত্বের ঘেরাটোপ হিসেবে, সেটাই আজ এক আধুনিকা সর্বজনাকাঙ্ক্ষিতা রমণীর মুক্তির বেশ।

কালো কাচ গাড়ির ঝামেলা নেই, অহর্নিশি ঘাড়ে-নিশ্বাস-ফেলা দেহরক্ষীর বেষ্টনী নেই, বোরখার ঘনকৃষ্ণ অনন্ত কারাগারই যেন মুক্তির এক অপার ঐশ্বর্যের 'গুপ্ত' সিংহদ্বার।

পথে ঘাটে, দোকানে বাজারে, বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে বা ভিড় বাসে চড়ে সাধারণ, স্বাভাবিক, অবাধ একজন হয়ে ওঠার সাময়িক ছদ্মবেশ। এই ছুটির নিমন্ত্রণ আমাদের কল্পনাবিলাসী মনে 'রোমান হলিডে'র মতো সুকুমার লাবণ্যময় আখ্যান সম্ভাবনারও জন্ম দেয়, আবার একটু খুঁটিয়ে দেখলে বোধহয় অনেক অনাবিষ্কৃত সত্যও মেলে ধরে।

—হঠাৎ বোরখা পরার শখ হল কেন তোমার?

—দুবাইতে একটা মেয়েকে দেখে, ঋতুদা। মেয়েটি ভারতীয় হিন্দু মেয়ে। একটা শো করতে গিয়ে আলাপ হয়েছিল। ও এমন এটা অদ্ভুত কারণ বলেছিল...যে আমি একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

—কী কারণ?

—মেয়েটি দেখতে ভীষণ সাদামাটা, কেবল চোখদুটো সুন্দর। বড় বড় দুটো চোখ, বাদামি রঙের মণি।

—তো?

—ও নাকি প্রায় খেলাচ্ছলে একবার বোরখা পরেছিল। সেখান থেকে একটা নতুন জিনিস আবিষ্কার করে

—কী?

—ওর যে সারাজীবনের কমপ্লেক্স, যে ওকে দেখে পথেঘাটে ছেলেরা ঘুরে ঘুরে তাকায় না, ওকে তেমন সুতসই দেখতে নয় বলে ওর বিষয়ে পুরুষদের তেমন আগ্রহ নেই, এই গোটা জিনিসটা নাকি বদলে গিয়েছিল ও বোরখা পরার পর।

—সে কীরকম?

—বোরখা মানেই একটা রহস্য, বুঝলে! বোরখার আড়ালে যে মেয়েটি তুমি তো তাকে দেখতে পাচ্ছ না, দেখছ কেবল তার চোখদুটো। এবার তাকে তোমার মনের মতো করে কল্পনা করে নিতে তো তোমার কোনও অসুবিধে নেই।

বোঝা গেল! বোরখা হল গিয়ে তাহলে চিত্রাঙ্গদার সুরূপা বেশ, মোহ আবরণের আড়ালে এক ক্ষণিক কাল্পনিক অনঙ্গমায়া।

—কিন্তু, তোমার তো আর [illegible] দেখতে বলে কোনও কমপ্লেক্স নেই। তোমাকে পথেঘাটে তাকিয়ে দেখার লোকেরও অভাব নেই...তাহলে?

—ঠিক বলেছ। ফলে আমার কাউকে ভাল করে দেখবার কোনও উপায়ও নেই। তোমরাই বল যে অভিনয় শেখার গোড়ার কথাই হল অবজার্ভেশন। সবক্ষণ যদি লোকে, আমার দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়েই থাকে—আমি তাদের অবজার্ভ করব কেমন করে? কোন ফাঁকে?

—অবজার্ভ করতে গিয়ে নতুন কোনও কিছু আবিষ্কার করেছ?

একটু থামল প্রীতি, বোধহয় ক্ষণিকের সংশয়ে

যিনি সর্বশক্তিমান বলে যুগ যুগ ধরে আমাদের পাপ পুণ্য, ন্যায় অন্যায়, ধর্ম অধর্মকে প্ররোচিত করে এসেছেন, এই পৃথিবীতে তাঁর কোনও অর্চনাগৃহ নেই

—বলব? আমাকে কম্যুনাল ভাববে না?

—না। বলো...

—আমি দেখেছি বোরখা পরে রাস্তায় বেরোলে লোকে দেখে বটে, কিন্তু কোথায় একটা অন্যরকম ব্যাপার আছে।

—সেটা আবার কী?

—হিন্দু ছেলেরা কিছুক্ষণ দেখে চোখ সরিয়ে নেয়। মুসলমান ছেলেরা কিন্তু ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকে। জানি না, কেন? হয়তো এটাকে তাদের ধর্মীয় অধিকার মনে করে।

২

'দ্য ইনভিজিবল ম্যান'-এর কল্প আখ্যান যে আসলে আমাদের প্রতিটি মানুষের কোনও একটি নিষিদ্ধ আকাঙ্খার গল্প, তা এতদিনে আমরা সকলেই জেনে গেছি।

নিজের বৈধ পরিচয়, সামাজিক অবস্থানের বর্তমানতা আমার জৈব জীবনে যে অলঙ্ঘ্য কতগুলো প্রাচীর গড়ে তুলেছে—নিজেকে অদৃশ্য করতে পারার ক্ষণিক কল্পনাবিলাস আমাদের সেই বৈধতার কারাগার থেকে মুক্তি দিতে পারে।

ফলে মিঃ ইন্ডিয়া ছবিতে অনিল কাপুরের নায়কীয় কীর্তি আমাদের কাছে আরও অনেক বেশি রোমাঞ্চকর হয়ে ওঠে. তা কেবল নায়কোচিত বলে যতটা, তার থেকে অনেকগুণ বেশি তা আমাদের মনের সুপ্ত অদৃশ্যায়নের অভীপ্সাকে প্রজ্বলিত করে বলে।

সামাজিক অনুশাসন আর আমাদের জৈব উপস্থিতির যে বিরোধ তার থেকে মুক্তির এক চোরা সুড়ঙ্গপথই এই বৈধতার বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ।

সামাজিক বৈধতার একটি স্থান-কাল মানচিত্র আছে। সেই মানচিত্রের সীমারেখার বাইরে আমাদের বৈধ উপস্থিতি অনেক সময় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। ঠিক যেভাবে চেনা পরিবেশ, চেনা শহর বা চেনা লোকজনের আড়ালে আমরা এক নতুন অনাড়ষ্ট জীবনভঙ্গি লাভ করি। সেই বৈধতার বাইরে গিয়ে আমরা নানা সময়ে নানা আত্মপরিচয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াই, হয়তো বা রোমাঞ্চিতও হই, তারপরেই আবার সেই নবলব্ধ পরিচয়কে সসংকোচ ছদ্মবেশের মতোই ব্যবহার করি। কারণ আমরা জানি, সামাজিক বৈধতা 'মানবমনের অপার বৈচিত্র্যকে কুঁকড়ে গুটিয়ে ছোট্ট করে আনতে চায় কেবল তার একমাত্রিক অনুশাসনলিপিতে।

সাইবারজগত বোধকরি সেই সীমাহীন ছদ্মপৃথিবীর এক নতুন সন্ধান।

এই রাজ্যে নিত্য জন্ম নেন অগণিত বাসিন্দা। তাঁরা জন্ম নেন, বসবাস করেন এবং নিজ নিজ বৈধতা সৃষ্টি করেন এই রাজ্যের নিয়মে নয়, তাঁর নিজস্ব জীবনযাপনের ভঙ্গিতে।

সাইবারপৃথিবীতে 'আমি কে', সেটা আমার নিজস্ব স্বীকারোক্তি। তার সঙ্গে পুলিশ ভেরিফিকেশন বা গেজেটেড অফিসারের সইসমৃদ্ধ সার্টিফিকেট-এর কোনও মূল্য নেই।

নিজস্ব ভঙ্গিতে নিজ পরিচয় সৃষ্টি করার পরও এই স্বীকারোক্তি পর্ব চলতে পারে। কেবল সেখানে কোনও বিশেষ শ্রোতার কোনও ভূমিকা নেই, এবং বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে নেই কোনও সামাজিক ইতিহাসসেতু। অতএব, সেই স্বীকারোক্তি বিশিষ্ট হতে বাধ্য।

এই রাজ্যে আমি নিজেই আমার পরিচয় সৃষ্টি করি, কোনও পিতা মাতা সমাজ প্রতিষ্ঠান তার দায়িত্ব নেন না। প্রয়োজনে সেই পরিচয় ভাঙি, ভেঙে আবার নতুন করে জন্মলাভ করি—কেবল এক জীবনে অনেকগুলো মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার আনন্দ চুরি করে পাই।

এই নতুন পৃথিবীতে একজনই অনুপস্থিত। তিনি বোধ করি ঈশ্বর।

মানবমনের নিবিড়তম, গহীনতম সৃষ্টি যে কল্পশক্তি—যিনি সর্বশক্তিমান বলে যুগ যুগ ধরে আমাদের পাপ পুণ্য, ন্যায় অন্যায়, ধর্ম অধর্মকে প্ররোচিত করে এসেছেন, এই পৃথিবীতে তাঁর কোনও অর্চনাগৃহ নেই।

ফলে সাইবারজগৎ প্রকৃত অর্থে amoral। সামাজিক জীব হিসেবে যে নীতিবোধ আমরা কখনও অভ্যাস করার অবকাশ পাই না, সাইবার জগৎ আমাদের সেই সমান্তরলতার সন্ধান দেয় অত্যন্ত সুচতুর গোপনতায়।

এমন এক দেশের স্বাধীন নাগরিকত্বের এক অদ্ভুত অভিনবত্ব আছে।

কিন্তু সন্দেহ হয়, যে এই দেশ কোনও দেশ নয়। বড়জোর উপনিবেশ বলা যেতে পারে। যেখানে, সুদূরবর্তী প্রায় যেন অন্তরীক্ষাবিষ্ট কোনও সার্বভৌমের কাছে আমাদের বারংবার নতিস্বীকার করতে হয়।

যে পরিচয় অবলম্বন করেই আমরা বাঁচতে চাই না কেন, তা আদতে সেই ঔপনিবেশিক শাসকের অনুমোদনসাপেক্ষ।

যে কোনও বাসিন্দার স্বীয়সৃষ্ট পরিচয়ের বৈধীকরণই এই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার প্রধানতম অনুশাসন, আমার ইউজার নেম। আমার পাসওয়ার্ড নির্বাচন করার প্রাথমিক স্বাধীনতাটুকুই আমার—আমার সেই স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেওয়ার সম্পূর্ণ ক্ষমতা তেমন সেই অদৃশ্য শাসকের।

আমার কল্পনা আমাকে সামাজিক বৈধীকরণ থেকে মুক্তি দেয়। আবার আমার সেই অলীককে বৈধতা দেয় এই নতুন জগত। ফলে, আদতে কোনও পরিচয়ই বৈধতা বহির্ভূত নয়।

আমার, ব্যক্তির স্থান তবে কোথায়?

৩

ছোটবেলায় হিন্দি সিনেমায় নায়কের নাম যখন হত বিজয় এবং তাঁকে সম্বোধন করা হত 'মিঃ বিজয়' বলে, বা নায়িকার নাম হত পূজা এবং তিনি অবশ্যই অভিহিতা হতেন 'মিস পূজা' বলে, স্বাভাবিকভাবেই সেটা আমাদের অনেকের কাছে প্রবল কৌতুককর ঠেকত।

বংশ পরিচয়, পদবি, সামাজিক ইতিহাসকে গৌণ করে দেওয়ার এই অভিনব প্রণালী আমরা হিন্দি সিনেমায় অন্তর্লীন মায়াবী বাস্তবের অঙ্গ বলে ধরে নিয়েছি।

আজ সাইবার স্পেস-এর সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে পাই, এখানে মানুষ তার সামাজিক ইতিহাসের পরিচয় এবং সেই পরিচয়ের স্বীকৃতির বৈধতা থেকে মুক্তিলাভ করেছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি মুক্ত যে পৃথিবীর স্বপ্ন আমরা যুগে যুগে দেখে এসেছি এ কি তারই এক নতুন পদক্ষেপ?

ঋতুপর্ণ ঘোষ

নবনীতা দেবসেন

হ্যাভ ফান, ইউজ কনডোম!

গ্লোবালাইজেশন কি সোজা স্মার্টনেস এনেছে আমাদের জীবন যাপনে? সরকারি বিজ্ঞাপনের ভাষা পর্যন্ত কী মারকাটারি হয়ে উঠেছে। আঃ, ঠিক যেন আমেরিকাতে আছি। প্রথম বিশ্বের মানুষেরা যেভাবে বাঁচে, ঠিক সেভাবে বাঁচছি আমরাও। ঝলমলে মল-এ মল-এ, সিনেপ্লেক্স-এ, বিগ বাজারে, ভীড়ে ভর্তি সুপারমার্কেটে, ফুড কোর্টে, আমাদের সব পেয়েছির দেশ। আঃ কী নেই আমাদের? সেক্সও আছে। ফ্রি ফান। লুকোচুরির ব্যাপার নেই। আমাদের পারমিসিভ সরকার বাহাদুরই খোলা চিঠি সেঁটে দিয়েছেন দেওয়ালে দেওয়ালে। সেদিন ট্রাফিক লাইটে গাড়ি থেমেছে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা সদন হাসপাতালের সামনে। হঠাৎ আমাদের নাকের ডগায় একটা বিজ্ঞাপন দেখে প্রাণ মন ভরে গেল। গ্লোবাল নরনারীর জন্য স্মার্ট ইংরিজি বিজ্ঞাপন, টানটান ভাষাটা যথার্থ টিন এজারদের উপযুক্ত। তাদের চোখ টানবে, মন কাড়বে। হ্যাভ ফান, ইউজ কনডোম! (সঙ্গে আছে উহ্য মনোবল সঞ্চার   নো প্রবলেম!) বুলাদির মতো ঘরোয়া উপদেশ নয়, সংসারী স্ত্রী পুরুষের দায়দায়িত্বের সঙ্গে তেমন যোগ নেই তার। এ হল সবজান্তা স্মার্ট

আল্লেকদের আরেকবার মনে করিয়ে দেওয়ার একটি নম্র. বিনীত প্রয়াস। বিজ্ঞাপনের ভাষা বলছে, ওরে, তোরা ফূর্তিফার্তা যা করবি কর, আমি শুধু সরকারি নিয়মরক্ষেটুকু করছি। আমি সরকার, এটা আমার বলার কথা. আবার তোদের মন যুগিয়েও চলার কথা, তাই বললাম। ভাবিসনা আমি নীরস, ভাবিস না আমি ওলড ফাশন্ড। আমি বিন্দাস, আমি গ্লোবাল। আমি ফানলাভিং।

হ্যাঁ. সেক্স খুব জরুরি, খুব মজা। অমনি কি আর তাকে ব্রহ্মস্বাদসহোদরা বলে সংবর্ধিত করছেন মুনি ঋষিরা? কিন্তু আহার নিদ্রা মৈথুনে তো শুধু পশুপক্ষীর সুখ সম্পূর্ণ. আমাদের আরও কিছু চাই। এমনকী সেক্সের আনন্দের পূর্ণতার জন্যেও চাই আরও কিছু। সেই আরও কিছু কি কনডোম? সতর্কতা অবলম্বন নিয়ে আমাদের নয়া নীতির এই অতি-স্মার্ট অতি-আধুনিক সরকারি বিজ্ঞাপনটা কিন্তু বড় কিম্ভুতকিমাকার। ভাষা ব্যবহারের রকমফের আমাদের একাধিক সংকেত দেয়। হ্যাভ ফান, ইউজ কনডোম। বাঃ, প্রথমেই হ্যাভ ফান? বিজ্ঞাপনের প্রধান কথা কি সেটাই? এতেই কনডোমের চেয়ে বেশি গুরুত্ব এসে পড়ে, মনে হয় যেন প্রাথমিকভাবে এনকারেজ করা হচ্ছে ফান-টাকে। ল্েজুড় হয়ে আসছে কনডোম। সবার আগে ফান, তারপরের কথা কনডোম। সরকার বাহাদুর এই ফান-এর জ্ঞান কাদের দিচ্ছেন? স্বামী-স্ত্রীদের? প্রণয়ীদের? কিন্তু এটা তো টিন এজারদের টিপসই মার্কা ভাষা। যদি তাদের কনডোমের কথা বলতে

আপাতত পৃথিবীতে সর্বোচ্চ এডস রোগীর সংখ্যা দক্ষিণ আফ্রিকাতে। তবে সুখবর এই, যে ২০১০-তে ভারতবর্ষের তাকে হারিয়ে দেওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে। ইউ এন রিপোর্ট নাকি তাই বলেছে শুনে এলুম

চাও, নিশ্চয়ই বলবে, বর্তমান অবস্থায় বলা হয়তো দরকারও কিন্তু বলো অন্যভাবে। আমার মনে হয় হাসপাতালের সামনের দেওয়ালে এই বিষয়ে বিজ্ঞাপন নিশ্চয়ই জরুরি, কিন্তু এই ভাষাতে নয়। বিষয় যতই জরুরি হোক, এই হ্যাভ ফান (পড়ুন হ্যাভ সেক্স ফর ফান) ইউজ কনডোম, বিজ্ঞাপনের চমকদার ভাষা, আমাদের ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক পটভূমিতে হাসপাতালের, স্কুল কলেজের, কিংবা গৃহস্থ বাড়ির দেওয়ালে মানায় না; খাজুরাহোর দিনে ফিরে যাওয়া কি এতই সহজ? কিন্তু বিজ্ঞাপনটি গণিকাপল্লির দেওয়ালের পক্ষে খুবই মানানসই। একেবারে ঠিকঠাক। এবং জরুরি। কিন্তু ভাবুন তো এই বিজ্ঞাপনই বাংলা ও হিন্দিতে অনুবাদ হলে কী হত? ফুর্তি করুন, কনডোম পরুন?—ফান কিজিয়ে, কনডোম লিজিয়ে? না কি, আরও ক্যাচি কপি হবে এইটে,—দিল মাঙ্গে মোর? কনডোম লেনা, শিয়োর!

কিন্তু মূল ব্যাপারটার গুরুত্ব কি তাতে বজায় থাকে?

সেদিন কয়েকজন দেহোপজীবিনীর সঙ্গে কথা বলছিলুম, তারা বলছিলেন, কনডোম ব্যবহার করা দুষ্কর, অধিকাংশ খরিদ্দার কনডোমের মাধ্যমে যৌন সুখে বিঘ্ন ঘটে বলে বিশ্বাস করেন। বাড়িতেও কনডোম, আবার এখানেও কনডোম? তা হলে আর মজা করতে আসা কেন? খরিদ্দারেরা অসন্তুষ্ট হন, চলে যান। অগত্যা কনডোম সরিয়ে রেখে, তোমার এইচআইভি আমার হউক, আমার এইচআইভি তোমার হউক, এমনধারা একটি মারণ মন্ত্রের সূত্রে গ্রন্থিত হয়ে যান দু'জনে। তার পরে সেই রোগ পৌঁছে যায় খরিদ্দারের স্ত্রীর শরীরে। তারপরে ছড়িয়ে পড়ে হবু সন্তানের রক্তে। কনডোম যে তাঁদের নিজেদের স্বাস্থ্যের নিরাপত্তার পক্ষেও প্রচণ্ড জরুরি, নিরুদ্বেগ পুরুষেরা এটা ভাবেন না। ভাবেন ওটার ব্যবহার শুধু মাত্র বারাঙ্গনাটিকে অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব থেকে রক্ষা করছে। তাদের স্বার্থে ওঁদের আগ্রহ থাকবে কেন? ওদের যা হয় হোক গে, আমার পৈসা উসুলের ফুর্তিটা তো আগে মিটিয়ে নিই। অচেতন পুরুষ এইভাবে, নিজের প্রকৃত স্বার্থ না বুঝে মৃত্যুর দরজার চাবি খুলে ফেলেন। সচেতনতা প্রসারের কাজ এখনও অনেক বাকি। বেসরকারি এনজিওগুলির চেষ্টা চরিত্রে, ও বুলাদি বিজ্ঞাপনের প্রকল্পে কিছু কাজ হচ্ছে। কিন্তু স্পষ্টতই তা যথেষ্ট নয়। দুঃখের বিষয় বেশ কিছু শিক্ষিত উদারচিত্ত নারীরও ধারণা কনডোম ব্যবহারে শুধু পুরুষ নয় নারীরও যৌনসুখে বিঘ্ন ঘটে। এই ধারণাটিও আমাদের পুরুষের কাছ থেকে ধার নেওয়া, আরও অনেক ভ্রান্ত সামাজিক ধারণার একটি। পুরুষের চোখে জীবনকে দেখার এই করুণ অভ্যাস মেয়েদের ছাড়তে হবে। তাতে নরনারী উভয়েরই মঙ্গল।

যথার্থ সচেতনতার অভাবেই আমাদের দেশে এখনও সরকারিভাবে এডস-এর যথাযথ চিকিৎসা, বা শুশ্রূষা, কোনও ব্যবস্থাই অদ্যাপি ঠিকঠাক গড়ে ওঠেনি। পশ্চিমবঙ্গে তো নয়ই। এডস রোগী এই অজ্ঞ সমাজে আজও ভয়ের ও ঘৃণার পাত্র। কলকাতার কাগজে এই বিষয়ে অনবরতই ভয়াবহ সব নির্দয়তার সংবাদ বের হয়। গত সপ্তাহেই পড়লুম এক এডস রোগীকে সমস্ত সরকারি হাসপাতাল থেকে ফিরিয়ে দিয়েছিল, শেষে কাকে যেন ধরে তাঁর স্ত্রী শেষ অবস্থায় যন্ত্রণা লাঘবের আশায় তাঁকে ভর্তি করলেও তিনি চিকিৎসা পাননি, স্যালাইনটাও নার্সরা বলেছেন স্ত্রীকে নিজের হাতে দিতে, ইঞ্জেকশনও তাঁকে দিতে বলা হয়েছে, গ্রাম্য সেই নারী প্রতিবাদ জানিয়েছেন, এসব কাজ তিনি কীভাবে করবেন? বিনা চিকিৎসায় বিনা শুশ্রূষায় স্বামীর মৃত্যুর পরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেহ সরানো হয়নি কেননা এডস রোগীর দেহ কেউ স্পর্শ করবে না। এমনকী ডোম পর্যন্ত দেহ সরাতে অস্বীকার করে। শেষে স্ত্রী এবং একজন সহৃদয় ব্যক্তি ধরাধরি করে মৃতদেহ সরান। এই তো, সে ২০০৭-এর কলকাতার সরকারি হাসপাতালের টাটকা খবর। স্বয়ং সুপারিন্টেন্ডেন্টও প্রকাশ্যে বলেছেন, ওদের কী দোষ? কী করে তুলবে? মৃত্যুর পরে বডি ফ্লুইডস বেরোয়, সে সব তো ছোঁয়াচে। তিনি জানেন না যে জীবিত রোগীর দেহ বা প্রাণহীন দেহ, যাই হোক, শরীরের বাইরে এসে বাতাসের স্পর্শ পেলে এডস-এর বীজাণু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে নিষ্কর্মা হয়ে পড়ে। তার আর অন্যকে সংক্রামিত করার ক্ষমতা থাকে না।

আমাদের দেশে এডস-এর রোগীকে রোগ যদিও বা না মারে, আমাদের অজ্ঞতা ও অমানবিক অস্পৃশ্যতা তাদের মেরে ফেলে।

আবার কাগজেই পড়েছি কলকাতারই এক জেলের যাবজ্জীবন দণ্ডিত কয়েদিরা মিলে পালা করে তাদের এক এডস রোগী বন্দী সতীর্থকে অসামান্য শুশ্রূষা করছে। তাঁদের আর কিসের ভয়?

আমাদের বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো। এদিকে এডস নিয়ে এত ভীতি, ওদিকে কনডোমের বিষয়ে এত অপ্রীতি। এই অসুখ যে নিষিদ্ধ সুখের পথে আসতে পারে, নেশার ইঞ্জেকশনের ছুঁচ দিয়ে ঢুকতে পারে, সে নিয়ে চিন্তা করিনা। এডস রোগীর সেবা মোটেই রোগের আসার রাজপথ নয়, আরও অনেক বেশি সতর্কতা নিয়ে রোগীর সেবা করা তো বহু সংক্রামক অসুখেই প্রয়োজন হয়।

এইচআইভি, এডস যাতে আপনার আমার না হয়, তারজন্য তো আমাদেরই সচেতন থাকতে হবে? প্রাণটা তো আমাদের! কনডোম আমাদের অনিবার্য প্রয়োজন রোগীকে এড়িয়ে চলা দরকার নেই।

সেফ সেক্সের বিজ্ঞাপনে তাই আমরা এত চাতুরী চাইনা, এত স্মার্টনেসে কাজ নেই, চাই সরল ও স্পষ্ট করে জরুরি অবস্থানটি বুঝিয়ে দেওয়া।

মনে করিয়ে দিতে হবে যে আজকের দিনে শুধু তো জন্ম নিরোধক নয়, কনডোম যে মৃত্যু নিরোধকও!

দুরারোগ্য করালব্যাধির প্রকোপের কথা তো ভুললে চলবে না। দায়িত্বহীন ফুর্তির পরবর্তী সম্ভাব্য কুফলের নিদারুণ উদ্বেগটি করালব্যাধির প্রকোপের কথা তো

ভুললে চলবে না। দায়িত্বহীন ফুর্তির পরবর্তী সম্ভাব্য কুফলের নিদারুণ উদ্বেগটি অনতিবিলম্বে জনমনে সংক্রমিত করা খুব জরুরি প্রয়োজন। বিজ্ঞাপনে বলা উচিত, কনডোম ইজ আ লাইফ সেভার। ইউজ ইট ফর ইয়োর ওন সেক। অথবা, স্টপ এডস! ইউজ কনডোম!

গুরুতর বক্তব্য হলে, বিজ্ঞাপনের সুর, স্বর সর্বজনীন হওয়া দরকার। বালক বৃদ্ধ, নারী পুরুষ, যাকেই বলবে, সত্যিটা সোজাসুজি বলা ভাল, সেভ ইয়োর লাইফ, ইউজ কনডোম! এমন করে লিখলে আমাদের দিশি সংস্কৃতির সঙ্গে মানানসই হত। কিংবা আর ইউ কেয়ারফুল? ইউজ কনডোম। ফুর্তি যদি এই বিজ্ঞাপনের ইউএসপি হয়, তাহলেও বলব, অন্ততপক্ষে উল্টে দাও শব্দবন্ধ দুটো। আগে তো লেখো জরুরি কথাটা, ইউজ কনডোম, তারপরে তোমার শুভেচ্ছাবাণী লিখবে, হ্যাভ ফান! ব্যাপারটাও তো সেইভাবেই হওয়ার কথা ফান যদি হয়েই গেল আগেভাগে, তারপরে আর কনডোমের কী বা কাজ?

আমাদের দুর্ভাগ্য কনডোম যে ফূর্তি-নিরোধক নয়, সে সত্য অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও বোঝেন না

কনডোম সত্যিই আমাদের জীবনরক্ষা করে, সে কথা তৃতীয় বিশ্বের পুরুষ জাতিকে বোঝানো সহজ নয়। এমন আত্মঘাতী জাত আর হয় না!

দক্ষিণ আফ্রিকাতে শুনছিলুম, শিগগিরই সেইদেশে এডস মহামারীর রূপ নিতে চলেছে, সচেতনতা সৃষ্টির বহু চেষ্টা সত্ত্বেও আটকানো যাবে বলে মনে হয় না। ওদের ভয়, দশ বছর পরে এক বিপুল সংকটের মুখোমুখি হবে দক্ষিণ আফ্রিকা, এই ভাবে এডস রোগ ও মৃত্যুর হার বেড়ে চললে, দশ বছর পরে ওদেশে কোনও কর্মযোগ্য সুস্থ সুঠাম তরুণ প্রজন্ম থাকবে না। এখন ১৫ থেকে ২৫ বছরের মেয়েরা প্রধানত এই রোগের শিকার, এবং যুবক পুরুষেরা। মৃত্যুর হারও প্রচুর। এখন গ্লোবাল কনসিউমারিস্মের ফলে গরিব মেয়েদের চতুর্দিকে সাজানো দামি জিনিসপত্র কেনার লোভ বেড়ে গিয়েছে, বিনা কনডোমে যৌন সংসর্গ, ও বিবেচনাবিহীন বহুগামিতা সেদেশের সমাজকে এই করুণ অবস্থাতে এনে ফেলেছে। পুরুষেরা সেখানে শুধু যে কনডোমের পাৎলা বিঘ্নটুকু সইতে পারেন না তাই নয়, তাঁরা নারী শরীরের নির্গত যৌন রসটুকুকেও সুখের পথে বিঘ্ন বলে বোধ করেন। তাঁরা পছন্দ করেন শুষ্ক যোনিপথ। তাই প্রণয়ীর পরিপূর্ণ সুখের জন্যে মেয়েরা নানা জড়ি বুটির সাহায্যে নিজের যোনিকে রসমুক্ত রাখেন। যদিও তার ফলে রুক্ষ ঘর্ষণে শুষ্ক গোপনাঙ্গের কোমল ঝিল্লি কোষ ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায়, তবুও, এটা নাকি তাদের বেশি আকর্ষণীয়া করে তোলে। তা হতে পারে, কিন্তু এডসকেও আকর্ষণ করে, ক্ষতস্থানে চট করে রোগের বীজ প্রবিষ্ট হয়। আপাতত পৃথিবীতে সর্বোচ্চ এডস রোগীর সংখ্যা দক্ষিণ আফ্রিকাতে। তবে সুখবর এই, যে ২০১০-তে ভারতবর্ষের তাকে হারিয়ে দেওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে। ইউ এন রিপোর্ট নাকি তাই বলেছে শুনে এলুম।

মানছি, রোগব্যাধির সচেতনতা তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তা বাদেও, ফান মানেই সেক্স, এটা ভাবার মধ্যে এবং ভাবানোর মধ্যে ধীমান প্রাণীর একটা অপমান আছে, মনুষ্য সংস্কৃতির উন্নততর, সূক্ষ্মতর, স্থায়ীতর আনন্দের উৎসগুলোর কিঞ্চিৎ হেরে যাওয়া আছে। ফান নিশ্চয় সেক্সের অবধারিত, অত্যাবশ্যক অঙ্গ, কিন্তু এও তো আমরা সবাই জেনে গিয়েছি যে ফান মানেই সেক্স নয়, সেক্স মানেই ফান নয়। সভ্যতার কল্যাণে মানুষের জীবনে আনন্দের উৎস এখন অনেক, বিচিত্র, এবং জটিল। শুধু সেক্সের উপভোগেই তার শুরু ও সারা নয়। আর কামের উপভোগেই যে কামনার শান্তি হয়না এ তো আমরা সেই বাল্যকালে চাণক্য শ্লোকেই পড়েছিলুম। সেখানে কামের অর্থ অবশ্য অনেক বিস্তৃত। ওই যে, বাসনা যখন বিপুল ধূলায় অন্ধ করিয়া অবোধে ভুলায়, এ কাম হচ্ছে সেই বস্তু, বাসনা। এখন আমাদের কলকাতার মলিন রাস্তাগুলিকে সোনার মুকুট পরিয়েছে যারা, সেই আলো ঝলোমলো বিনোদিনী মলগুলিতে বিদ্যুতের আড়ালে আমি দেখতে পাই ওই বিপুল ধুলোয় অন্ধ করে দেওয়া সর্বনাশী সর্বগ্রাসী কালো।

হায়, মূল্যবোধের স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্যে কি কোনও জবরদস্ত কনডোম সৃষ্টি হয় না, যা দিয়ে আমাদের বোধ বুদ্ধি বিবেচনাকে এই আত্ম বিধ্বংসী লোভের সংক্রমণমুক্ত রাখতে পারি?

৩০.০৬.০৭

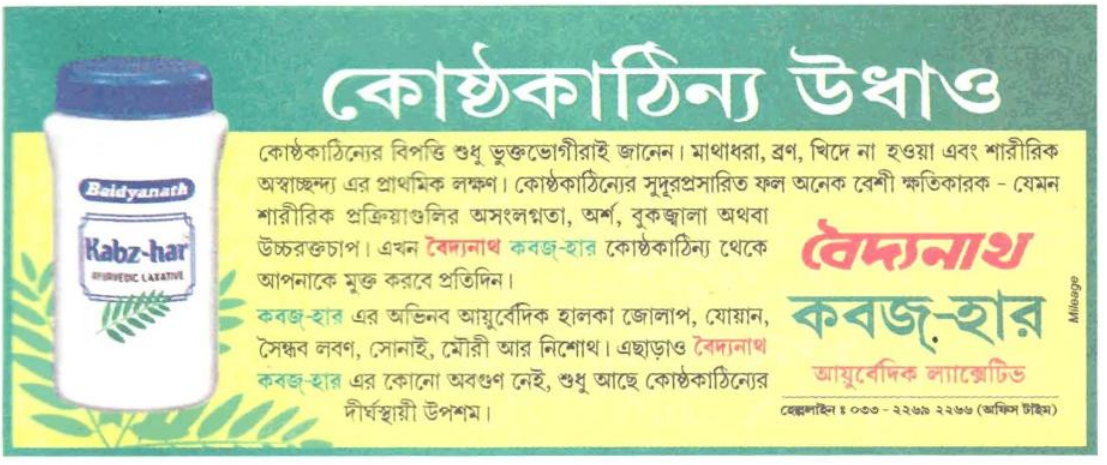

এ
এবার
মলাট

মাউস ট্র্যাপ

মাউস টিপে দুষ্টুমি।
জগৎ জালে নষ্টামি।
নেটে, ঘেঁটে, খুঁটে, খেটে নেটিয়
পাজিদের পাঁজি লিখলেন
অনুব্রত চক্রবর্তী

১৯৯৫। মেক্সিকোর সমুদ্রতটে ছুটি কাটাতে আসা ঝলমলে যুবতী অ্যাঞ্জেলা বেনেট স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি তার নিজের দেশে ফেরার অভিজ্ঞতা কত ভয়াবহ হতে পারে! এক ইন্টারনেট বন্ধুর পাঠানো একটি ডিস্ক অ্যাঞ্জেলার অজান্তে তাকে ঠেলে দিয়েছে মরণ-বাঁচন সমস্যার মধ্যে। ইন্টারনেট হ্যাকার জ্যাক ডেভলিনের হাত থেকে বাঁচার জন্য মেক্সিকোর ছুটি বাতিল করে অ্যাঞ্জেলা ফিরে এল আমেরিকায়। কিন্তু আমেরিকায় ঢোকামাত্র হাড় হিম করা অভিজ্ঞতা! অ্যাঞ্জেলা আবিষ্কার করল সরকারি নথিপত্রে সে এখন রুথ মার্ক্স—মার্কিন গোয়েন্দাদের 'মোস্ট ওয়ান্টেড'। এরপর থেকে অ্যাঞ্জেলার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত বাঁচার লড়াই—রুথ মার্ক্স নয়, অ্যাঞ্জেলা বেনেট হিসেবে। একদিকে ইন্টারনেট গুপ্তচক্রের ওই গোপন ডিস্ক চুরি করার চেষ্টা, অন্যদিকে রুথ মার্ক্সকে ধরার জন্য সারা দেশ জুড়ে পুলিশের জাল। অ্যাঞ্জেলা কি পারবে জটিল অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে? অসহায় অ্যাঞ্জেলা আঁকড়ে ধরল তার একমাত্র বন্ধুকে—ইন্টারনেট!

২০০২। কোড নেম 'এএফ', বাড়ির কম্পিউটারে লগ ইন করেছে ইন্টারনেট-এ। বয়স অল্প হলেও এএফ স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতে পারে ইন্টারনেটের আনাচে-কানাচে। হ্যাকিং, অর্থাৎ সিক্রেট কোড পড়ে ফেলে বিভিন্ন ওয়েবসাইট-এ বেনামে ঢুকে পড়া তার নেশা। এমন সময় 'টুং' শব্দ করে মেল বক্স জানান দিল নতুন ই-মেল এসেছে সেখানে। এএফ-এর এক হ্যাকার বন্ধু পাঠিয়েছে ছোট্ট ই-মেল। যা পড়ে স্তম্ভিত এএফ। একটি ইন্টারনেট দুষ্টচক্র গভীর ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে 'চ্যাট-রুম'-এ বসে। একটি ভারতীয় ওয়েবসাইটকে হ্যাক করে তার তথ্য পাল্টে দেবে তারা। কয়েক সেকেন্ড ভাবল এএফ দেশের জন্য কিছু করে দেখাবার ইচ্ছে অনেকদিনের এই সুযোগ। নিজের ইন্টারনেট পরিচয় পাল্টে ফেলে এএফ ঢুকে পড়ল ওই চ্যাট রুম-এ। আড়ি পেতে জেনে ফেলল তাদের যাবতীয় প্ল্যান। তারপর সেই প্ল্যান পাঠিয়ে দিল এক ইন্টারনেট সিকিওরিটি সংস্থাকে ভারতীয় সংস্থাটি ওয়েবসাইট বন্ধ করে দিল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পাল্টে ফেলা হল সফটওয়্যার। ব্যবহার করা হল উন্নততর প্রযুক্তির 'প্যাচ'।

উপরের দুটি ঘটনাই সাইবার ক্রাইম এবং তার বিরুদ্ধে লড়াই-এর চূড়ান্ত নিদর্শন। প্রথমটি হলিউডের বক্স-অফিস সিনেমা 'দি নেট'। অ্যাঞ্জেলা বেনেটের ভূমিকায় সান্দ্রা বুলকের দুর্দান্ত অভিনয় আমাদের মনে আছে নিশ্চয়ই। আর পরেরটি সত্য ঘটনা! ষোলো বছরের 'এএফ' অর্থাৎ অঙ্কিত ফাদিয়ার নাম ইন্টারনেট জগতে ছড়িয়ে পড়তে মাত্র কয়েক ঘণ্টা লেগেছিল। সাইবার ক্রাইম আধুনিক সমাজের সব থেকে বড় সমস্যা। অপরাধ আগেও ছিল, এখনও আছে এবং থাকবে— পকেটমারি, চুরি, রাহাজানি, ডাকাতি, খুন থেকে যুদ্ধ পর্যন্ত। রামায়ণের সব থেকে উত্তেজনাপূর্ণ মোকাবিলা কিন্তু ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ! মেঘের আড়াল থেকে বিন্দাস টার্গেটে তির মেরে যাচ্ছিলেন ইন্দ্রজিৎ। অনেক ছলাকলা করে তাঁকে বধ করা গেল। সাইবার অপরাধীরাও কিন্তু লুকিয়ে আছেন অনন্ত সাইবার স্পেসের ঝোপে ঝাড়ে। কখনও তাঁরা ইন্দ্রজিৎ নামে তির ছুড়ছেন, কখনও বা মেঘনাদ। ধরা যে পড়বেনই—এমন গ্যারান্টি অতি বড় কম্পিউটার বিশেষজ্ঞও দিতে পারবেন না।

প্রথম সাইবার ক্রাইম

সাইবার কথাটি কম্পিউটার ও ইন্টারনেট-এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, প্রথম সাইবার ক্রাইম হিসেবে ঐতিহাসিক মূল্য পেয়ে থাকে যে ঘটনাটি, তার সঙ্গে কম্পিউটারের কোনও সম্পর্ক নেই। কারণ তখন কম্পিউটারের 'ক' পর্যন্ত লেখা হয়নি। এই সংগঠিত অপরাধটি ঘটে ১৮২০ সালে। ফ্রান্সের এক কাপড় কারখানার মালিক জোসেফ মারি জ্যাকার্ড একটি তাঁত যন্ত্র তৈরি করেন, যার সাহায্যে খুব অল্প সময়ের মধ্যে একটি জটিল নকশাকে কাপড়ে এঁকে ফেলা যাবে। জ্যাকার্ডের কর্মীরা প্রমাদ গুনলেন। এই যন্ত্র চালু হলে তো অনেকের চাকরি নিয়ে টানাটানি। যথাসময়ে যন্ত্র চালু হল এবং জ্যাকার্ড আকাশ থেকে পড়লেন! তাঁর সাধের যন্ত্র বেগড়বাই করছে—ঘোড়া আঁকতে গাধা এঁকে ফেলছে! জ্যাকার্ড তাঁত বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলেন। আসলে হয়েছিল কী, জ্যাকার্ডের অজান্তে তাঁর কর্মীরা তাঁতের নকশায় কিছু ওলটপালট করে দেয়। আমাদের রাজ্যে অবশ্য মালিকপক্ষকে সমস্যায় ফেলার অনেক সহজ রাস্তা আছে। তাই হয়তো এখানে সাইবার ক্রাইমের প্রবণতা একটু কম।

নব্বই দশক থেকে ইন্টারনেটের জনপ্রিয়তা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 'সাইবার' কথাটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নিঃশব্দে ঢুকে পড়ল। বিশ্বব্যাপী কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে গড়ে ওঠা জগৎকেই আমরা 'সাইবার স্পেস' বলি। বাড়ির কম্পিউটার থেকে মোডেমের মাধ্যমে, অফিসে থাকলে অফিস নেটওয়ার্ক, সাইবার কাফে, রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে, মায় মহাকাশ থেকেও চাইলেই আপনি ঢুকে পড়তে পারেন সাইবার স্পেস-এ। আর এই সাইবার স্পেস-এর হাত ধরেই আমাদের সংসারে চোরা গোপ্তা হানা দিচ্ছে সাইবার ক্রাইম। আধুনিক যুগে সাইবার ক্রাইম বলতে আমরা কম্পিউটার বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংগঠিত অনৈতিক বে-আইনি অসামাজিক কার্যকলাপকেই বুঝি। আমাদের সমাজে চোর-ছ্যাঁচোড়, গুণ্ডা-বদমাইশ চিহ্নিত করার জন্য যেমন আইন আদালত, পুলিশি ব্যবস্থা আছে, তেমনই সাইবার অপরাধীদের পাকড়াও করার জন্যও রয়েছে সাইবার আইন।

পুলিশের ক্রাইম ব্র্যাঞ্চের বিশ্বজোড়া নেটওয়ার্ক।

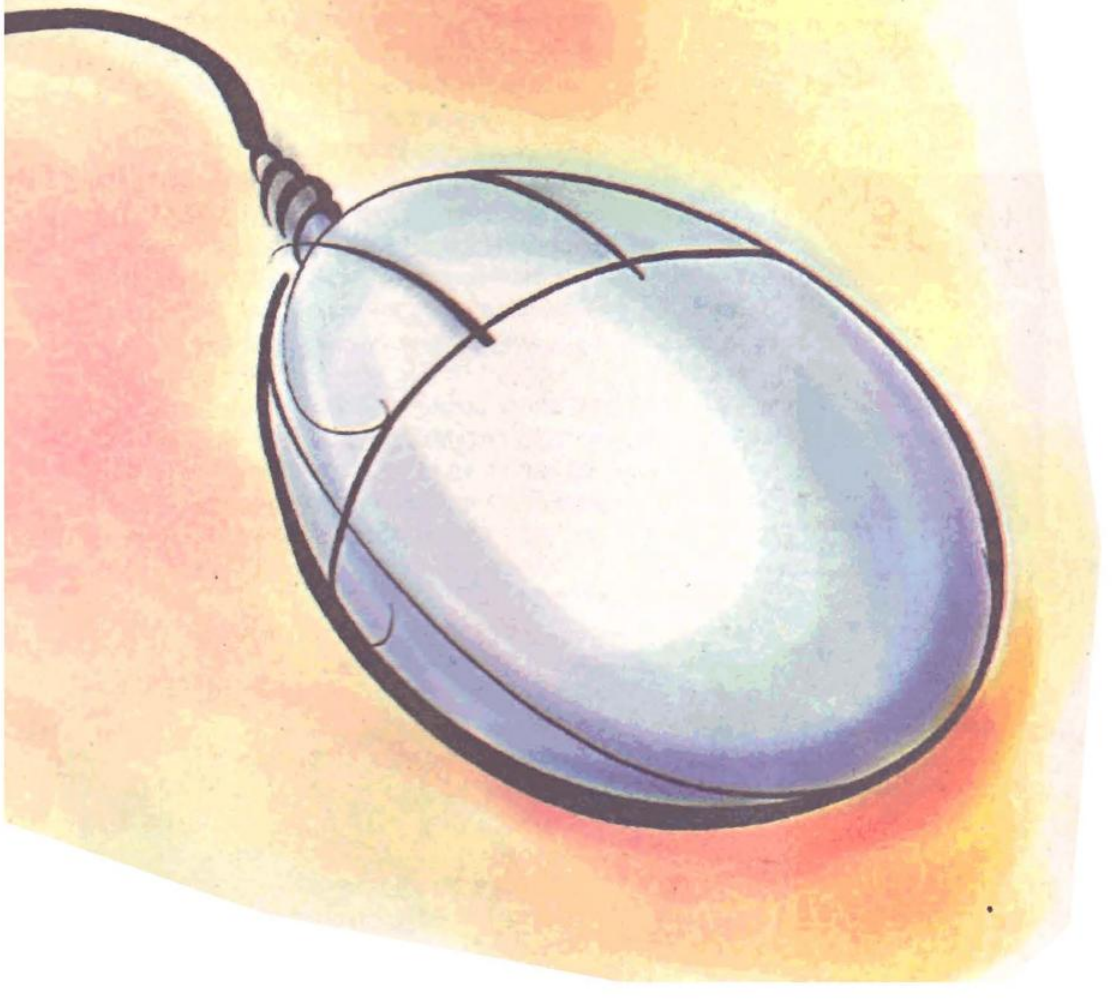

শহরের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পাঁচ তরুণীকে দু'মাস অন্তর দু'টি অশ্লীল ই-মেল (ছবি-সহ) পাঠানোর দায়ে লালবাজারের গোয়েন্দাদের হাতে ধরা পড়ে এক সফটওয়্যার বিশেষজ্ঞ। সুরজিৎ পাল (২৬) নামে ওই তরুণকে গোয়েন্দা বিভাগের সাইবার অপরাধ দমন শাখার অফিসাররা সল্টলেকে তার অফিস থেকে গ্রেফতার করেন। এটিই ছিল কলকাতা পুলিশের প্রথম মামলা যেখানে তথ্য প্রযুক্তি আইন কার্যকর করা হয়েছিল। আইনের ৬৭ নম্বর ধারায় সুরজিতের বিরুদ্ধে কম্পিউটার ব্যবহার করে 'পর্নোগ্রাফি' প্রচারের অভিযোগ আনা হয়। এই আইনে পাঁচ বছর পর্যন্ত সাজা হতে পারে এবং সঙ্গে মোটা টাকা জরিমানাও গুনতে হতে পারে। ধৃত সুরজিৎ মনিপাল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে এমএসসি পাশ করে সল্টলেকের একটি সংস্থায় সিস্টেম অ্যানালিস্ট হিসাবে কাজ করছিল। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, প্রথমবার 'হেল্প লাইন' নামে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পাঁচ তরুণী কাউন্সেলরকে ই-মেল করে অশ্লীল বার্তা পাঠায় সুরজিৎ। প্রথমে সংস্থা কর্মীরা ভাবেন, অফিসের কেউই এই কাজ করছে। মাস দুয়েক পরে ফের আর একটি অশ্লীল ই-মেল পাঠায় সে। এরপর সংস্থার তরফে গোয়েন্দা বিভাগে অভিযোগ দায়ের করা হয়। গোয়েন্দারা কম্পিউটার সংস্থাগুলির সাহায্য নিয়ে খুঁজে পান সুরজিতকে।

কিন্তু আইন থাকলেই আইন ভাঙার উপায়ও থাকে। নিছক মজা করার জন্য, কাউকে অপমান করার জন্য, অথবা বৃহত্তর গোষ্ঠী, এমনকী কোনও দেশের সামরিক ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড় করিয়ে দিতে সাইবার স্পেসে সক্রিয় হয়ে উঠেছে এক বা একাধিক হ্যাকার। তৈরি হয়েছে সাইবার গুপ্তচক্র।

সাইবার ক্রাইমের রকমফের

গত এক দশকে আমরা কম্পিউটার ভাইরাস কথাটির সঙ্গে সড়গড় হয়ে গেছি। অনেকদিন আগে কলকাতায় বাসে এক বয়স্ক ভদ্রলোককে তাঁর সহযাত্রীর কাছে অভিযোগ জানাতে শুনেছিলাম—ছেলের চাকরি সম্বন্ধে। অফিসে ওনার ছেলেকে সারাদিন কম্পিউটারের সামনে বসে থাকতে হয়, তাই নাকি থেকে থেকে ভাইরাল জ্বর! নব্বই-এর দশকে এই কথাটি শুনে খুব হাসি পেয়েছিল। কিন্তু ভাবুন তো একদিন সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে আবিষ্কার করলেন আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফাঁকা! অথবা আপনার নামে আপনারই বন্ধুদের কাছে পাঠানো হয়েছে অকথ্য ভাষার অসংখ্য ই-মেল। আপনার ও আপনার সঙ্গীর ঘনিষ্ঠ অবস্থার ছবি ছেপে দেওয়া হয়েছে পাবলিক ওয়েবসাইট-এ। ভাইরাল জ্বর হলে তবু কয়েক ঘটি জল মাথায় ঢাললে কমে যেতে পারে, কিন্তু ওপরের ঘটনাগুলোর যে কোনও একটা ঘটলেই আপনাকে রাঁচির টিকিট কাটার কথা ভাবতে হতে পারে। কিংবা দেখবেন, সেটাও কেউ আপনার নামে আগে থেকে কেটে রেখেছে!

সাইবার ক্রাইম সামান্য দুষ্টুমি থেকে শুরু করে দেশদ্রোহিতার পর্যায়ে পৌঁছতে পারে। সাইবার স্পেসে যে ধরনের ক্রাইম সচরাচর চোখে পড়ে তার কিছু উদাহরণ দিচ্ছি—

বে-আইনি আর্থিক লেনদেন

ইন্টারনেট-এ ক্রেডিট কার্ড-এর অপব্যবহার এই ধরনের অপরাধের সংখ্যা বাড়ার অন্যতম কারণ। ধরুন, একটি স্মার্ট ঝকঝকে ওয়েবসাইট-এ ঢুকে আপনি দেখলেন সস্তায় কিছু দুষ্প্রাপ্য জিনিস বিক্রি হচ্ছে। দারুণ দাঁও মারা যাবে ভেবে আপনি আপনার ক্রেডিট কার্ড নম্বরটি দাঁ

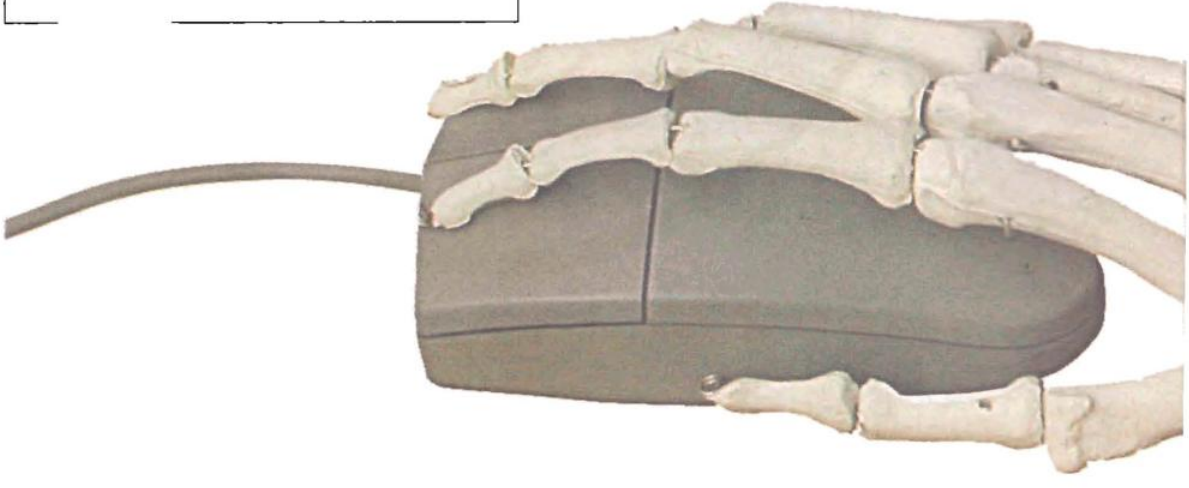

কয়েক দিন আগের ঘটনা। স্বামী-স্ত্রী পরিচয় দিয়ে এক জোড়া যুবক-যুবতী নিউ মার্কেটের একটি গয়নার দোকানে গিয়ে ২০ হাজার ৫০০ টাকা দামের সোনার হার কেনেন। নগদে দাম না মিটিয়ে যুবতীটি দেন একটি 'ইন্টারন্যাশনাল ক্রেডিট কার্ড'। দোকান মালিক বিল দিলে তাতে সইও করেন যুবতী। এর পর ফের ওই যুবতী আরও তিনটি দামি সোনার হার পছন্দ করেন এবং একটিরও দরদাম না করে কিনতে চাইলে দোকান মালিকের সন্দেহ হয় এবং তিনি 'ক্রেডিট কার্ড' যে ব্যাঙ্কের সেই সিটি ব্যাঙ্ক-এর ক্রেতা পরিষেবা দফতরে ফোন করেন। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ বিষয়টি জেনে তাদের অপরাধ দমন শাখার অফিসারদের নিউ মার্কেটের দোকানটিতে পাঠান। খবর দেওয়া হয় স্থানীয় নিউ মার্কেট থানাতেও। ব্যাঙ্ক অফিসাররা ক্রেডিট কার্ডটির ১৬ সংখ্যার নম্বর নিজেদের 'সিস্টেম'-এ প্রবেশ করিয়ে জানতে পারেন যে, কার্ডটি চিনের এক নাগরিকের। বর্তমানে তিনি সিঙ্গাপুরের বাসিন্দা। কলকাতা পুলিশ যুবতীকে গ্রেফতার করে এবং সেদিনই ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের হোটেল থেকে যুবতীর দুই পুরুষ সঙ্গী ইকবাল খান জাহিদ এবং সইফুর রহমানকেও ধরে ফেলেন তদন্তকারীরা। জানা যায় রীতা খানের নামে ওই জাল ক্রেডিট কার্ড তৈরি করে কার্ডের পিছনে গ্রাহকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বিষয়ক যাবতীয় তথ্য সম্বলিত 'ম্যাগনেটিক স্ট্রিপ'টি ওই চিনা নাগরিকের আসল ক্রেডিট কার্ড থেকে 'কপি' করে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মুম্বই, চেন্নাইতে এই ধরনের কয়েকটি সাইবার অপরাধের উদাহরণ থাকলেও কলকাতায় এটিই প্রথম অত্যাধুনিক মানের সাইবার অপরাধ। রাজ্য গোয়েন্দা পুলিশ সিআইডি-এর ডিআইজি (অপারেশন) রাজীব কুমারের কথায়, 'ওই সময়ে কিছু অসাধু কর্মীর যোগসাজশে অনেকের ক্রেডিট কার্ডের ম্যাগনেটিক স্ট্রিপটি কপি করে রাখা হয়। সেগুলো পরে মোটা টাকায় বিক্রি হয়ে যায় এক শ্রেণির সাইবার অপরাধীদের কাছে। তারা সফটওয়্যার-এর মাধ্যমে জাল ক্রেডিট কার্ডের পিছনে ওই ম্যাগনেটিক স্ট্রিপ বসিয়ে দেয়। এইভাবে চলে জালিয়াতি। বিদেশে এরকম অনেক সাইবার অপরাধের খবর পাওয়া গিয়েছে। আমাদের দেশেও এই অপরাধের প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে।'

করে লিখেছিলেন। মাসখানেক বাদে বিল দেখে চক্ষু চড়কগাছ। এদিকে সেই দুষ্প্রাপ্য বস্তুটি অধরাই থেকে গেল। ইন্টারনেট-এ ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করার আগে সাবধান হোন। ওয়েবসাইটটি সম্বন্ধে খোঁজখবর নিন। দেখুন ক্রেডিট কার্ডে দাম মেটানোর জন্য আলাদা কোনও 'পেমেন্ট গেটওয়ে' বা ওয়েবসাইট আছে কিনা। ওয়েবসাইট ছাড়াও শুধুমাত্র কম্পিউটার-এ রাখা হিসেবপত্র মুছে দিয়েও তছনছ করা যেতে পারে লক্ষ লক্ষ টাকা। ইদানীং আমরা এই ধরনের সাইবার ক্রাইমের উদাহরণ পেয়েছি আমাদের এই শহরেই। জনসাধারণের কাছ থেকে রীতিমতো রসিদ কেটে ট্যাক্স-এর টাকা নেওয়ার পর কম্পিউটার থেকে মুছে দেওয়া হয়েছিল সেই তথ্য। এর পেছনে ছিল অত্যন্ত ধুরন্ধর একটি চক্র। আপনার আমার টাকা এরা তো আত্মসাৎ করলই, তার ওপর তথ্য মুছে যাওয়ার দরুন সবার কাছে পৌঁছে গেল কর আদায়ের নোটিশ ফাইন সমেত। কম্পিউটার সফটওয়্যার নিশ্ছিদ্র করা, একাধিক প্রতিষ্ঠানকে নজরদারির কাজে লাগানো এবং ডিজিটাল ফরেনসিক টেকনোলজি ব্যবহার করার মাধ্যমে এই ধরনের সাইবার ক্রাইমের সম্ভাবনা কমানো যেতে পারে।

সাইবার পর্নোগ্রাফি

আধুনিক সমাজের কাছে অন্যতম কঠিন চ্যালেঞ্জ। এই মুহূর্তে সাইবার স্পেসে অগুনতি পর্নোগ্রাফিক সাইট রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে অসংখ্য 'চাইল্ড পর্নো' সাইট। এমনকী স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও জড়িয়ে পড়ছে পর্নো-সাইট বানানোর কাজে। দিল্লির এক নামকরা স্কুলের ছাত্র রঞ্জিতের (নাম পরিবর্তিত) কথাই ধরা যাক। ছোটবেলার চিকেন পক্সের দাগ রঞ্জিতের সারা মুখে। সেই নিয়ে অশান্তির শেষ নেই। বন্ধুরা সারাক্ষণ জোকার, ভ্যাম্পায়ার ইত্যাদি বলে খ্যাপায়। রঞ্জিত ঠিক করল প্রতিশোধ নেবে এবং তার উপায়টি হবে অভিনব। স্কুলের কয়েকটি অনুষ্ঠানে ছবি তোলার দায়িত্ব নিয়ে নিজের ডিজিটাল ক্যামেরায় সে তুলে ফেলল বন্ধুদের এবং

তাদের আত্মীয়স্বজনদের ছবি। ডিজিটাল ক্যামেরা থেকে সেই ছবিগুলো কম্পিউটার-বন্দি হল কয়েক মিনিটে। অল্প কয়েকদিনের অভ্যাসে রঞ্জিতের আয়ত্তে এল মর্ফিং সফটওয়্যার ব্যবহার করার জারিজুরি। তারপর বন্ধুদের এবং তাদের আত্মীয়স্বজনদের মুখ বসিয়ে দিল ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করা কিছু আপত্তিকর ছবির ওপর। নিজের শিল্পচেতনা নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার পর রঞ্জিত সেই ছবিগুলো আপলোড করে দিল একটি পাবলিক ওয়েবসাইটে।

শেষ পর্যন্ত রঞ্জিতের এক বন্ধুর বাবার নজরে পড়ে ওই ছবিগুলো। দিল্লি পুলিশ গ্রেফতার করে রঞ্জিতকে। এই ঘটনাটিতে রঞ্জিত দোষী নিঃসন্দেহে। কিন্তু তার অপরাধ প্রবণতার মূলে তার বন্ধুদের অমানবিক ব্যবহার। কিন্তু ভেবে দেখুন, যারা বিশ্বব্যাপী ব্যবসা ফেঁদেছে চাইল্ড পর্নোগ্রাফি নিয়ে, হোটেলের ঘরে, শপিং মল-এর ট্রায়াল রুমে, লুকনো ক্যামেরায় ধরে রাখছে কারুর নিতান্ত ব্যক্তিগত মুহূর্ত, পরে তা ছড়িয়ে দিচ্ছে সাইবার স্পেসে—এই অপরাধীদের কি ক্ষমা করা যায়? বিখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মুখ মর্ফিং করে যৌনদৃশ্য 'ম্যানুফ্যাকচার' করার ব্যবসা তো রমরমিয়ে চলছে গত এক দশক ধরে। ধরপাকড়ও চলছে সমান তালে, কিন্তু সব পর্নোসাইট কবে পর্ণ কুটির-এ রূপান্তরিত হবে তা বলা যাচ্ছে না।

বে-আইনি সামগ্রী বেচা-কেনা

ইন্টারনেটের মাধ্যমে বেনামে দেদার কেনা-বেচা চলছে ড্রাগ, অস্ত্র, বন্যপ্রাণীর চামড়া ইত্যাদির। আপনার মেল বক্সে ঢুকলে রোজই দেখতে পাবেন অসংখ্য স্প্যাম মেল অর্থাৎ যে মেলগুলো এসেছে আপনার অচেনা কোনও ই-মেল আইডি থেকে। এগুলোর বেশিরভাগই অনভিপ্রেত। এই স্প্যাম মেল-এর অনেকগুলোই হয়তো পর্নোগ্রাফি সংক্রান্ত। তারপরেই রয়েছে নিষিদ্ধ ড্রাগ যেমন ঘুমের ওষুধ, সিডেটিভ বা অ্যান্টি-সাইকোটিক ওষুধ। বিদেশে এইসব ওষুধ ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে অবিশ্যি সে সবের বালাই নেই। কাশির ওষুধ থেকে ঘুমের ওষুধ-কিনতে ও খেতে কোনও সমস্যা নেই। এর ফলে আমাদের দেশ থেকে বিদেশে এই ধরনের ড্রাগ পাচারের ঘটনাও কিন্তু ক্রমশ বাড়ছে।

সাইবার বদনাম

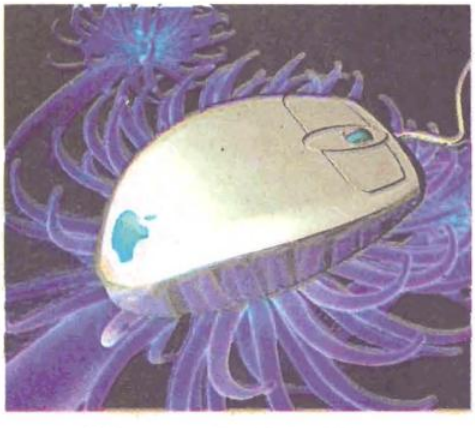

আজ রেবেকার এনগেজমেন্ট। পার্টির আগে ম্যাক্সের সঙ্গে কিছুটা সময় একান্তে কাটানোর উদ্দেশ্যে রেবেকা এসেছে ম্যানহাটনের অভিজাত এলাকার এক কফি শপে। কিন্তু অপেক্ষার যেন শেষ নেই। ওদিকে পার্টির সময়ও এগিয়ে আসছে। হতাশ হয়ে রেবেকা যখন কফির দাম চুকিয়ে উঠতে যাচ্ছে, হঠাৎ এসে হাজির হল ম্যাক্স সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত চেহারা। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর ম্যাক্স যা বলল তাতে রেবেকার হার্ট ফেল হওয়ার জোগাড়। ম্যাক্স এই বিয়ে চায় না! কারণ? আজ সকাল থেকে ম্যাক্সের কাছে অসংখ্য ই-মেল এসেছে রেবেকার সহপাঠীদের কাছ থেকে। তাতে রয়েছে রেবেকার একাধিক বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে প্রেমের নাটক চালিয়ে যাওয়ার আখ্যান। ম্যাক্স ল্যাপটপ খুলে লগ-ইন করল তার মেল বক্সে। রেবেকা কিন্তু মেলগুলোয় একবার চোখ বুলিয়েই বুঝতে পেরেছে যে সেগুলো মিথ্যে। তার ঘনিষ্ট কোনও বন্ধু এই স্টাইলে ইংরেজিও লেখে না। ম্যাক্সকে বুঝিয়ে উঠতে লাগল ঘণ্টাখানেক। তারপর দু'জনে মিলে এক দৌড়ে নিউ ইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সাইবার ক্রাইম সেল। দিনদুয়েকের তদন্তে জানা গেল, রেবেকার এক

দেশ জুড়ে রীতিমতো ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বিভিন্ন কল সেন্টারের তথ্য পাচারের চক্র তৈরি করে বসা কলকাতার এক যুবককে গ্রেফতার করেছিল সিআইডি-র সাইবার অপরাধ দমন শাখা। নাগপুর থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করা সুশান্ত চন্দক (২৯) নামে ওই যুবককে দিল্লি থেকে কলকাতায় এনে গ্রেফতার করা হয়। দমদম নাগের বাজারের প্রাচী গার্ডেন আবাসনের বাসিন্দা সুশান্তর বিরুদ্ধে কলকাতারই একটি কল সেন্টারের গ্রাহক ব্রিটিশ সংস্থার তথ্য চুরি করে অন্য একজনের হাতে তুলে দেওয়ার অভিযোগ ছিল বলে জানিয়েছিলেন গোয়েন্দারা। কিন্তু সেগুলো সে বিক্রি করেছিল কি না, তা নিয়ে সন্দেহ ছিল। সুশান্তর বক্তব্য, চাকরি পাওয়ার লোভেই সে তথ্যগুলো চুরি করেছিল। কলকাতার একটি কল সেন্টারে কারিগরী বিশেষজ্ঞ হিসাবে চাকরির সূত্রে সুশান্তর সঙ্গে আলাপ হয় এক তরুণীর। ওই সহকর্মীটির সঙ্গেই পরিচয় ছিল চ্যানেল ফোর-এর সাংবাদিকের। এরপরে সুশান্তর কাছে প্রস্তাব আসে যে, একজন ব্রিটিশ প্রপার্টি ডিলার কলকাতায় কল সেন্টার খুলতে চান। সহকর্মী তরুণীটি এজন্য সুশান্তর সাহায্য চান। এরপরেই এক ব্রিটিশ মহিলা আসেন এবং তাঁকে সুশান্ত বলে সে তথ্য পাচারে দক্ষ। তার প্রমাণও দেয়। এভাবেই চ্যানেল ফোর-এর স্টিং অপারেশন-এ ধরা পড়ে সুশান্ত। পরে পুলিশ পিছনে লেগেছে বুঝতে পেরে সে নিজের কম্পিউটারের হার্ড ডিস্কটিও খুলে নিয়ে দিল্লি চলে যায়।

তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সল্টলেকে বসে ইন্টারনেটের মাধ্যমে মার্কিন মুলুকে কোটি কোটি টাকার মাদক ব্যবসা চালানোর দায়ে সঞ্জয় কেডিয়া নামে এক কল সেন্টার কর্ণধারকে প্রায় আট মাস আগে গ্রেফতার করেন মাদক নিয়ন্ত্রণ ব্যুরোর গোয়েন্দারা। ধৃত সঞ্জয়ের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ৩০০ মার্কিন ডলার এবং নগদ ২৪ লক্ষ টাকা। গোয়েন্দা সূত্রের খবর, 'এক্সপন আইটি' ও 'এক্সপন ওয়েবসাইট' নামে দু'টি তথ্য প্রযুক্তি সংস্থার কর্ণধার সঞ্জয়। অভিযোগ, তিনি ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমেরিকা ও অন্য আরও কয়েকটি দেশে 'অন-লাইন' মাদক কেনা-বেচার কাজ চালাতেন। ধৃতের আইনজীবী এ কে জৈন অবশ্য সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, 'মিথ্যা অভিযোগে সঞ্জয়কে ধরা হয়েছে। কোনও তথ্য প্রমাণই পাওয়া যায়নি। সঞ্জয় নিজে মাদক নিয়ন্ত্রণ ব্যুরোর দফতরে দেখা করতে যান। তখনই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।' গোয়েন্দারা জানান, ইন্টারনেটের মাধ্যমে মাদক ব্যবসা প্রথম নজরে আসে মার্কিন. গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই-এর। তাঁরা প্রাথমিক অনুসন্ধান চালিয়ে কলকাতার যোগসূত্র পান। আমেরিকাতে মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত এক ব্যক্তিকে গ্রেফতারও করে এফবিআই। এরপরেই কলকাতার যোগাযোগের কথা জানানো হয় কেন্দ্রীয় মাদক নিয়ন্ত্রণ ব্যুরোকে।

প্রাক্তন সহপাঠী যাকে সে প্রত্যাখ্যান করে, এটা তার কাণ্ড। ম্যাক্স-রেবেকার বিয়ে ভেঙে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সাইবার বদনামের রাস্তা নেওয়ার মতো অনেক উদাহরণ আমাদের দেশেও পাওয়া যাবে।

সাইবার জোঁক

ইয়ার্কি হচ্ছে? জোঁক না জোক? আজ্ঞে না! শুধু জোঁক নয়, সাইবার ছিনে জোঁক! এ এক অদ্ভুত অপরাধ প্রবণতা। আপনি চ্যাট রুম-এ একটু নিভৃতে আলাপচারিতা করছেন, হঠাৎ ঢুকে পড়ল এই সাইবার অপরাধী। আজেবাজে বকে আপনার মেজাজ দিল বিগড়ে। বিরক্ত হয়ে আপনি নিজের মেল চেক করতে গেলেন। কি গেরো! হাজার জোকস পাঠিয়ে বসে আছে ছিনে জোঁক! মুখ ঘুরিয়ে বুলেটিন বোর্ড-এ গেলেন। দেখলেন সেখানে আপনার নামে সংকীর্তন হচ্ছে। মুখরোচক কেচ্ছার নায়ক হয়ে আপনি লোকের মুখে মুখে ফিরছেন। এই ছায়ানুসরণের বিরুদ্ধে লড়াই কিন্তু সহজ নয়। চটজলদি সমাধান হল ওই ছিনে যাতে আপনাকে চিনে নিতে না পারে তার ব্যবস্থা করা। অর্থাৎ পরিচয় পাল্টান। নিজের নাম যদি তকাই হয় তাহলে করুন বিস্কুট। মানে নিখরচায় একেবারে সাইবার এফিডেভিট!

আপাতদৃষ্টিতে সাইবার ছায়ানুসরণকারীদের মতলব সাধারণ—আপনাকে সাইবার বিব্রত করা। কিন্তু পাকা অপরাধীরা নিঃশব্দে অনুসরণ করে চলে তাদের টার্গেট-কে। তারপর ব্যক্তিগত কিছু তথ্য হ্যাক করে ফেলতে পারলেই ঝোপ বুঝে কোপ মারে তারা।

সাইবার সন্ত্রাস

সাইবার ক্রাইমের উদাহরণ হিসেবে এখনও পর্যন্ত যা লিখেছি তা সবই তুচ্ছ মনে হবে সাইবার স্পেসের মাধ্যমে সন্ত্রাসের সম্ভাবনার কথা শুনলে। ভয় পাবেন না, ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ধ্বংসের ঘটনা এখনও পর্যন্ত ঘটেনি। আশা করা যায় ভবিষ্যতে এই ইন্টারনেট-ই আমাদের আগলে রাখবে সন্ত্রাসবাদীদের হাত থেকে। তবে এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই আজকের সাইবার সমাজের সামনে কঠিনতম চ্যালেঞ্জ হল সাইবার টেররিজম। ব্রুস উইলিস অভিনীত 'ডাই হার্ড-টু' মনে পড়ে? একদল সন্ত্রাসবাদী দখল করে নিয়েছে এয়ারপোর্টের কম্পিউটার নেটওয়ার্ক। হুমকি দিচ্ছে যখন তখন দুর্ঘটনা ঘটিয়ে দেওয়ার। সে যাত্রা ব্রুস একাই জিতে নিলেন লড়াই। কিন্তু বাস্তবে যুদ্ধটা অত সহজ নয়।

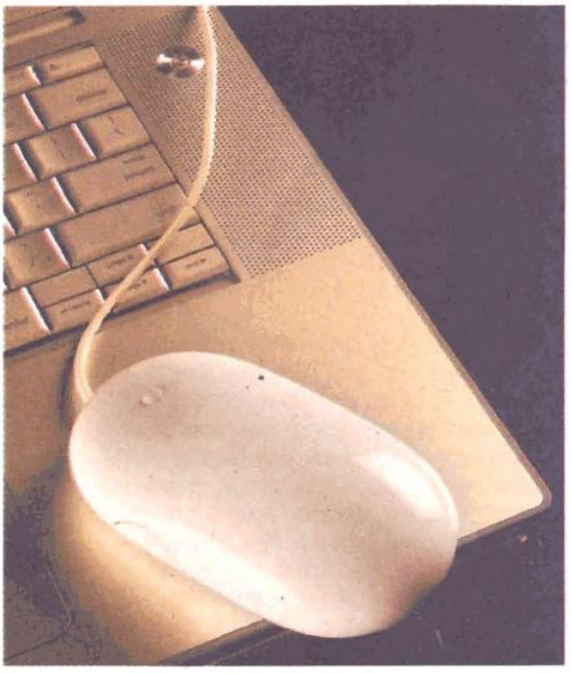

আমি সন্দীপ ঘোষ অমুক ব্যাঙ্ক থেকে বলছি। আপনার ক্রেডিট কার্ডটি আপগ্রেড করে দেব। যদি আপনি দয়া করে একদিনের জন্য কার্ডটি দেন—ঠিক এই ভাষাতেই সবিনয়ে টেলিফোন এবং তারপরে কার্ড হস্তগত হওয়ার দিন দু'য়েকের মধ্যেই তা ফেরত। এই পর্যন্ত সব ঠিকই ছিল। বিপত্তি বাধল যখন ব্রড স্ট্রিটের বাসিন্দা ব্যবসায়ী অনির্বাণ সেনগুপ্ত ক্রেডিট কার্ডের বিল পেয়ে দেখলেন তাঁর কার্ড ব্যবহার করে এয়ার ডেকানের পাঁচটি টিকিট কাটা হয়েছে। বিশ্বাস করে কার্ড তুলে দেওয়াতেই যে তিনি জালিয়াতদের খপ্পরে পড়েছেন, তা বোঝার পর পুলিশের দ্বারস্থ হন। লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগ তদন্তে নেমে জালিয়াতির দায়ে পোস্তা থানা এলাকার একটি পর্যটন সংস্থার মালিক অভিষেক গুপ্ত এবং একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কের 'ডাইরেক্ট সেলস এজেন্ট' সন্দীপ ঘোষকে গ্রেফতার করে। গোয়েন্দা প্রধান জানিয়েছিলেন, 'সন্দীপ অনির্বাণবাবুর ক্রেডিট কার্ডের সব তথ্য জোগাড় করে অনির্বাণবাবুকে টেলিফোন করে। তারপর তাঁর ক্রেডিট কার্ডটি নিয়ে অভিষেককে দেয়। অভিষেক সেটা দিয়ে বিমানের টিকিট কাটে। এমনভাবে আরও চারটি ক্রেডিট কার্ড সন্দীপ হাতিয়ে এনে অভিষেককে দেয়।"

অঙ্কিত ফাদিয়ার তৎপরতায় আটকানো গিয়েছিল একদল সাইবার সন্ত্রাসবাদীকে। কিন্তু কয়েক হাজার সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী ইন্টারনেটের মাধ্যমে নিরন্তর হুমকি দিয়ে চলেছে আমাদের। অস্ট্রেলিয়ার সন্ত্রাসবাদ বিশেষজ্ঞ ক্লাইভ উইলিয়ামস দাবী করেছেন অদূর ভবিষ্যতে সাইবার সন্ত্রাসের চেহারা দেখব আমরা। সাইবার সন্ত্রাসবাদীরা প্রতিনিয়ত পরিকল্পনা করে চলেছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোনও কোনও দেশের গুরুত্বপূর্ণ ইনস্টলেশন গুলোর দখল নেওয়ার, যেমন এয়ারপোর্টের ট্র্যাফিক কন্ট্রোল ব্যবস্থা, রেলওয়ের ট্র্যাক পাল্টানোর স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা, নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশনের জ্বালানি বা স্পেস শাটল লঞ্চিং প্যাড-এর কম্পিউটার নেটওয়ার্ক।

১৯৯৭ সালে আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ সাইবার সন্ত্রাসের একটি মহড়া দেয়। জনা পঁয়ত্রিশ বাছাই করা হ্যাকারকে চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয় নিরাপত্তা নেটওয়ার্কের পাসওয়ার্ড জেনে ফেলার জন্য। ভাবলে শিউরে উঠতে হয় মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হ্যাকাররা নিরাপত্তা নেটওয়ার্কে ঢুকে বন্ধ করে দেয় পাওয়ার গ্রিড এবং ৯১১ ইমার্জেন্সি পরিষেবা। গত দশ বছরে মার্কিন দেশের অজস্র কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ, যাঁদের মধ্যে অনেকেই ভারতীয় ধীরে ধীরে প্রায় নিশ্ছিদ্র করে তুলেছেন সে দেশের নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক। তা সত্ত্বেও কিন্তু আটকানো যায়নি ৯/১১-র মারণযজ্ঞ। কারণ? এর পিছনে ছিল ক্ল্যাসিকাল সন্ত্রাসবাদ।

সাইবার অপরাধ ব্যক্তিগত কম্পিউটার ও কম্পিউটার নেটওয়ার্কের গণ্ডি ছাড়িয়ে ঢুকে পড়েছে মোবাইল ফোনের জগতেও। সাধারণ আপাতনিরীহ অপরাধ ছাড়াও ক্রমশ বেড়ে চলেছে মোবাইলে ভাইরাস সংক্রমণ। কয়েক বছর আগেই জাপানের আড়াই কোটি মোবাইল ব্যবহারকারী সেই অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। তাঁদের প্রত্যেকের ফোনে কোথা থেকে উড়ে আসে এক অদ্ভুত ই-মেল, যা পড়লেই নিজের অজান্তে ডায়াল হয়ে যাচ্ছিল ১১০, জাপানের ইমার্জেন্সি পরিষেবার নম্বর।

সাইবার আইন, এথিক্যাল হ্যাকিং

সাইবার ক্রাইম ঠেকানোর জন্য কোনও সাই-বাবা নেই। আছে সরকারি আইন, দেশ-বিদেশের পুলিশের বিশেষ সেল এবং অঙ্কিত ফাদিয়ার মতো হ্যাকারদের গোষ্ঠী—এথিকাল হ্যাকারস। টেকনোলজি পাল্টে যাচ্ছে প্রায় প্রতিদিন এবং তা আরও উন্নত হচ্ছে। তবে তার সঙ্গে বাড়ছে ক্রাইমও। অদূর ভবিষ্যতে 'নেটওয়ার্কড হোম' তৈরি হয়ে গেলে বিপদ তো আরও বাড়বে—হ্যাক করে কেউ লক করে দিল কেউ আপনার বাড়ির দরজা! তারপর সারারাত কাটালেন সাইবার কাফেতে। এটা এখন এক দুঃস্বপ্নের মতো, কিন্তু সত্যি হতে বেশিদিন লাগবে না।

সরকার বাহাদুররা তাই নড়ে চড়ে বসেছেন। প্রায় প্রত্যেক দেশেই চালু হয়ে গেছে সাইবার আইন। আমাদের দেশে ইন্টারনেট টেকনোলজি অ্যাক্ট চালু হয়েছে ২০০০ সালে। ভারতীয় পেনাল কোডের অধীনেও দণ্ডনীয় বেশ কিছু সাইবার ক্রাইম। ভারতের প্রায় প্রত্যেকটি বড় শহরে পুলিশ বিভাগ চালু করেছে সাইবার সেল। মুম্বই, বেঙ্গালুরুতে পুলিশ-জনতার যৌথ উদ্যোগে গড়ে উঠেছে সাইবার ল্যাব—সাইবার ক্রাইম

ট্রেনিং সেন্টার। ২০০৬ সালের শেষে এক সমীক্ষায় প্রকাশ—সাইবার ক্রাইমজনিত বিশ্বব্যাপী আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ চল্লিশ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছুঁই ছুঁই। ইন্টারনেট ক্রাইম কন্ট্রোল সেন্টার-এর রিপোর্ট অনুযায়ী অধিকাংশ সাইবার অপরাধী ঘর বেঁধেছেন আমেরিকায় (৬০.৯%)। তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ব্রিটেন (১৫.৯%)।

শুধু সরকারি প্রচেষ্টা দিয়ে কিন্তু আটকানো যাবে না সাইবার সন্ত্রাস। আমাদের আশ্বস্ত করে একটি তথ্য—পৃথিবীতে এই মুহূর্তে যে হারে সাইবার অপরাধী বাড়ছে তার থেকে অনেক বেশিমাত্রায় বাড়ছে 'এথিক্যাল হ্যাকিং' গোষ্ঠী। কিন্তু এই গোষ্ঠীর কাজ? আগেই লিখেছি হ্যাকিং-এর অর্থ হল, অনুমতি ছাড়াই অন্যের কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা ব্যক্তিগত ইলেকট্রনিক তথ্য ভাণ্ডারে ঢুকে পড়া। সাইবার অপরাধীরা এক এক জন দুর্দান্ত হ্যাকার। আর এথিক্যাল হ্যাকারের উদ্দেশ্য ঠিক উল্টো—তুখোড় বিশ্লেষণের সাহায্য নিয়ে কোনও প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বিশেষের কম্পিউটার বা নেটওয়ার্কে প্রবেশ করা এবং কাল বিলম্ব না করে সিস্টেমের এই দুর্বলতার কথা সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে জানিয়ে দেওয়া রবীন্দ্রনাথ সাধে বলেছিলেন 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।'

এই মুহূর্তে সারা বিশ্বে ডিজিটাল ফরেনসিক টেকনোলজির খুব কদর। কম্পিউটার হার্ড ডিস্ক থেকে তথ্য মুছে দিলেও বিশেষ কিছু যন্ত্রের সাহায্যে আবার সংগঠিত করা যায় সেই তথ্য একই সঙ্গে জনপ্রিয় হচ্ছে 'ই-ডিসকভারি' বা ই-আবিষ্কার ইলেকট্রনিক তথ্যকে অপরাধী খুঁজে বের করার কাজে লাগানোর চেষ্টায় সারা পৃথিবীতে গড়ে উঠছে সাইবার ফরেনসিক গোষ্ঠী।

ভ্লাদিমির লেভিন, রাশিয়া; যোহান হেলসিনজিয়াম, ফিনল্যান্ড। কেভিন সিটনিক, আমেরিকা। তিনজনেই সাইবার অপরাধী। তিনজনই দুর্দান্ত সফটওয়্যার প্রোগ্রামার। এরা যখন সাইবার ক্রাইম করতে গিয়ে ধরা পড়ে তখন এদের বয়স একুশ কিংবা বাইশ। শুনতে অবাক লাগছে? আরও আশ্চর্য হবেন যদি শোনেন সংখ্যাতত্ত্বের হিসেবে অপেশাদার হ্যাকার এবং সাইবার অপরাধীদের অধিকাংশই নাবালক—বয়স নয় থেকে ষোলোর মধ্যে। মনস্তত্ত্ববিদদের মতে অন্যের কম্পিউটারে বেআইনি অনুপ্রবেশ এই বয়সের বালক-বালিকাদের যুদ্ধ জয়ের সমান আনন্দ দেয়। তাদের অধিকাংশেরই ধারণা নেই যে এর ফল কী মারাত্মক হতে পারে। এই শ্রেণির এক ধাপ ওপরে থাকবে সংগঠিত হ্যাকার গোষ্ঠী। প্রতিবেশী এক রাষ্ট্রের এইরকমই এক গোষ্ঠীর সাইবার আক্রমণে একবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল আমাদের দেশের প্রায় দুশোটি নামকরা ওয়েবসাইট। কর্পোরেট দুনিয়ায়ও সাইবার অপরাধে জড়িয়ে পড়ার ঘটনা বেড়ে চলেছে। অফিসে নিয়মকানুন না মেনে নেটওয়ার্ক সেটিং পাল্টে নিজের পছন্দের চ্যাটরুমে ঢুকে পড়া বা আপত্তিকর ওয়েবসাইট ভ্রমণও কিন্তু সাইবার ক্রাইমের আওতায় পড়বে। তবে সংস্থার আর্থিক ক্ষতি বা বদনাম রটানোর মূলে আছেন কিছু কর্মচারী যাঁরা উপরওয়ালার ওপর কোনও কারণে বীতশ্রদ্ধ। ১৮২০ সালের সাইবার ক্রাইমের ঘটনা এই ২০০৭ সালেও কিন্তু প্রতিদিন ঘটছে।

লেখা শেষ করে লগ ইন করলাম। প্রায় শ'খানেক ই-মেল জড়ো হয়েছে। তারমধ্যে পঁচাত্তরটা স্প্যাম। পঁচিশটি চেইন মেল বন্ধুবর্গের সাইবার ঝগড়ার ফসল। বাকি দশটি ব্যাঙ্ক, এয়ারলাইনস অথবা হোটেলের বিজ্ঞাপনী প্রচার। সবক'টিকে মুঠোয় ধরে মুছে দিলাম। হঠাৎ মনে হল, ভুল করেছি। একটা মেল বোধহয় কারুর ব্যক্তিগত ই-মেল আইডি থেকে এসেছিল। ট্র্যাশ বিন-এ গিয়ে উদ্ধার করলাম সেই মেলটি। ভাইরাস নয় তো? মেরে ফেলবে না তো আমার সাধের কম্পিউটারটিকে? মাউসে ডাবল ক্লিক করে খুলেই ফেললাম—চোখের সামনে ডানা মেলল রঙিন প্রজাপতি, সঙ্গে ঝরনার শব্দ— গ্রিটিংস কার্ড! মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো বোধহয় পাপ। টুকরো খবর রাজর্ষি দত্তগুপ্ত

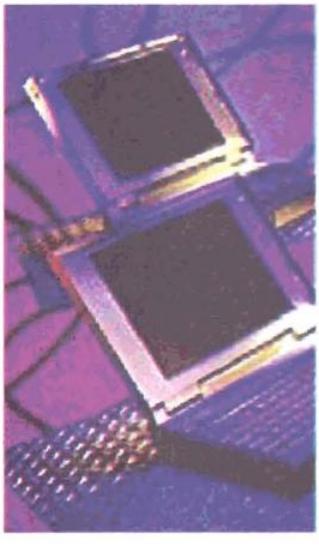

বড়দিনের দিন আচমকাই নিজের ই-মেল অ্যাকাউন্টে 'সুইস ফার্স্ট ব্যাঙ্ক অফ এশিয়া'র 'ফান্ড ট্রান্সফার ম্যানেজার' হংকং নিবাসী হিলারি উরফ-এর লম্বা চিঠি পান তেঘরিয়া ক্লাব টাউন রোডের বাসিন্দা রাজীব খান্ডেলিয়া। লেখা ছিল, টমাস রাজীব নামের এক ব্যক্তি মোটর দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন। তাঁর গচ্ছিত ৭ মিলিয়ন ডলার একজন ভারতীয় নাগরিকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট মারফৎ পাওয়া যেতে পারে। তাই রাজীব খান্ডেলিয়া যদি কর বাবদ ১,০৩,৫০০ টাকা ইন্টারনেটে চেন্নাইয়ের একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কে মহেশ গুপ্তা নামের ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে 'ট্রান্সফার' করে দেন, তবে তার বিনিময়ে ৭ মিলিয়ন ডলারের ৩০ শতাংশ টাকা তিনি পাবেন। হিলারির আবেদনে সাড়া দিয়ে রাজীব তাঁর বারাণসীর ব্যাঙ্ক-কে নির্দেশ দেন ওই টাকা চেন্নাইয়ের নির্দিষ্ট ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দিতে। পরে রাজীব জানতে পারেন পুরো বিষয়টিই একটি প্রতারণা চক্র। তখন প্রথমে সিবিআই-এর কাছে যান তিনি। সিবিআই রাজীবকে সিআইডি-র কাছে পাঠায়। সেইমতো তিনি সিআইডিকে অভিযোগ জানানোর সঙ্গে সঙ্গেই গোয়েন্দারা চেন্নাইয়ের ওই ব্যাঙ্কের সঙ্গে কথা বলে রাজীবের টাকা ট্রান্সফার বন্ধ করান। এরকম ই-মেল প্রত্যেকদিন অনেকেই পান। কখনও ফান্ড ট্রান্সফার, কখনও লোভনীয় লটারিতে জিতে লক্ষ লক্ষ পাউন্ডের হাতছানি, কখনও বা কোনও বিদেশি যুবতীর বিয়ের প্রতিশ্রুতি এবং অনেক টাকা নিয়ে এদেশে চলে আসার প্রস্তাব, এমন নানা কিছু। গোয়েন্দাদের সাবধানবাণী, "এমন কোনও ই-মেল দেখলেই তা হয় মুছে ফেলুন, নয়তো উপেক্ষা করুন।"

উইকিম্যাপিয়া

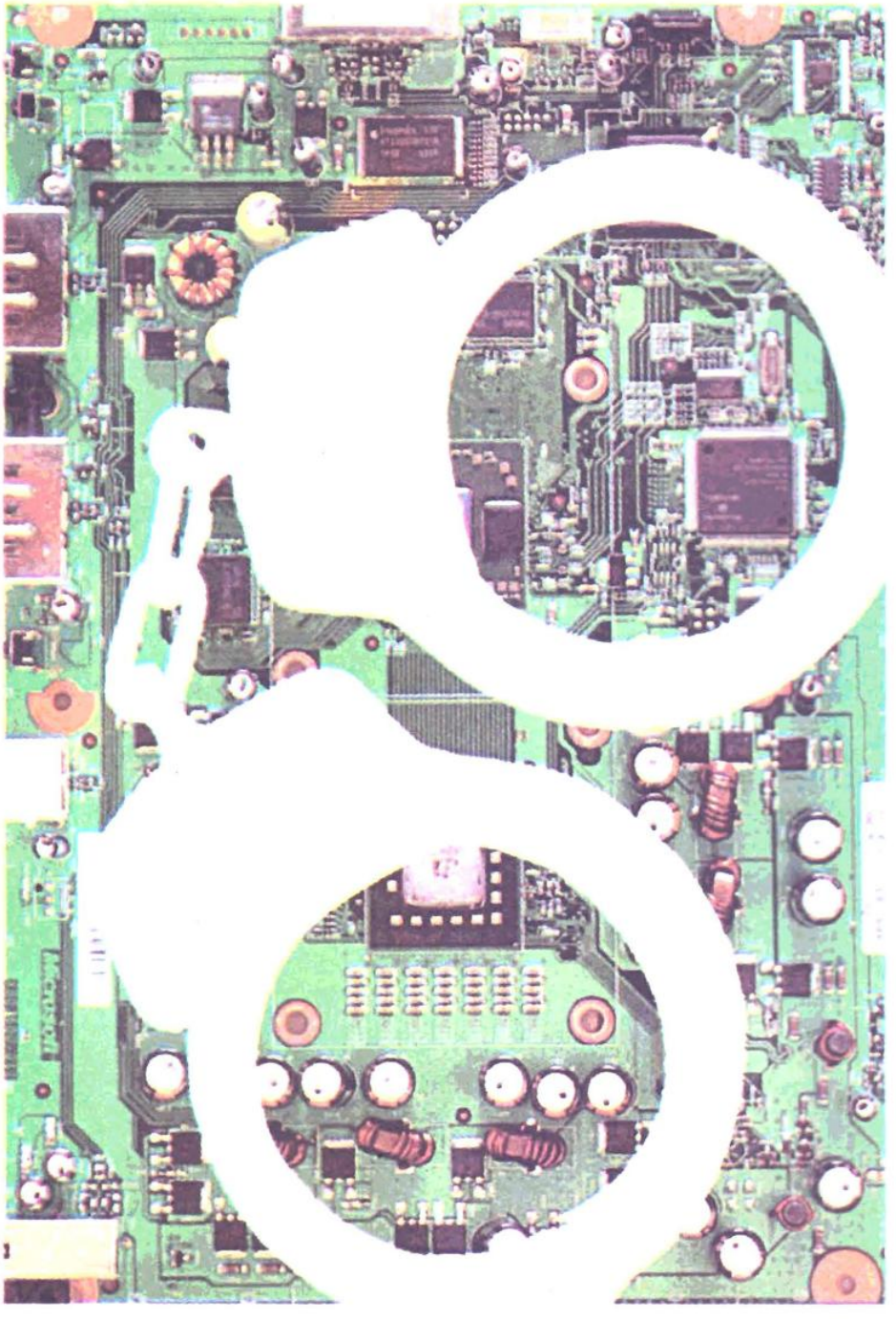

দূরাদয়শ্চক্র নিভস্য...। কালিদাসের মেঘদূতম্‌ই যেন আজকের উইকিম্যাপিয়া। মেঘের বদলে মাউসের পিঠে চেপে দুনিয়া দর্শন। সেই উইকিম্যাপিয়ার হালহদিশ দিলেন পীযূষ আশ

মৌলবাদী নন। সন্ত্রাসবাদী নন। বয়স মেরেকেটে ছাব্বিশ। তবুও তাঁর কীর্তিতে দিশেহারা গোয়েন্দা-পুলিশ।

নাম ইভজেনি সাভেলিয়েভ। জাতে রুশ। পড়াশুনো করেছেন মস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটিতে, পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে। বিরাট গবেষক নন, বড় বড় ডিগ্রিও নেই। স্রেফ স্নাতক। তবুও, তিনি, আর তাঁর বন্ধু আলেকজান্দ্রে কোরিয়াকাইনে যা করেছেন, তাতে মাথা চুলকোতে হচ্ছে দুঁদে গোয়েন্দাদেরও। আপাতদৃষ্টিতে তাঁদের দোষ কিছু নেই। বরং, সাইবার যুগের যা স্লোগান—সেই দুনিয়াটাকে এনে দিয়েছেন হাতের মুঠোয়।

সত্যিই হাতের মুঠোয়। কিংবা বলা ভাল, মাউস ক্লিক-এ। তাঁদের অবদান একটি ওয়েবসাইট। www.wikimapia.org। আর তার দৌলতেই ম্যানহাটন থেকে মেটিয়াবুরুজ, পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তের অলিগলি তস্য গলি ঘুরে বেড়ানো, পাড়া বেড়ানোর মতোই সহজ।

ওয়েবসাইটের নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে এঁদের কাজ-কারবার ম্যাপ নিয়ে। ইন্টারনেটে 'ম্যাপ সার্ভিস' কম নেই। যে দেশের মানচিত্র দরকার, তা সার্চ-এ দিলেই হল। কয়েক সেকেন্ডে কয়েকশো মানচিত্রের হদিশ মিলবে কম্পিউটারের পর্দায়। সাভেলিয়েভরা সে-পথে হাঁটেননি। তাঁরাও মানচিত্র দিয়েছেন, কিন্তু তা হাতে আঁকা ছবি নয়। উপগ্রহ থেকে তোলা পৃথিবীর ছবিটাই অনলাইন করে দিয়েছেন। তাই www.wikimapia.org-এ যে ম্যাপ দেখা যাবে, তা এই গ্রহটারই আসল ছবি। প্রতিটি দেশের নিখুঁত চিত্ররূপ।

www.wikimapia.org-এর জন্ম ২০০৬ সালের ২৪ জুলাই। এক বছরের মধ্যেই বিপুল জনপ্রিয় উইকিম্যাপিয়া। আর কেনই বা হবে না! ধরুন, সাইবার দুনিয়ায় খুঁজে দেখবেন কল্লোলিনী তিলোত্তমাকে। উইকিম্যাপিয়ার সার্চে দিন 'কলকাতা' বা 'ক্যালকাটা'। কয়েক লহমায় পর্দায় হাজির হয়ে যাবে শহরের এরিয়াল ভিউ। বাঁ পাশে রয়েছে প্লাস-মাইনাস স্কেল। ম্যাপ ইচ্ছা করলে ছোট বড় করতে পারেন। এবার জায়গা ধরে-ধরে এগোন। একটু খুঁজলেই পেয়ে যাবেন

শহরের নামী ইংরেজি মাধ্যম স্কুল-কলেজের শিক্ষিতা, খ্যাতনামা সংস্থা থেকে ফ্যাশন ডিজাইনিংয়ের কোর্স শেষ করে সল্টলেক সেক্টর-৫-এর একটি কল সেন্টারে কাজ করছিলেন ঝকঝকে স্মার্ট যুবতী ঠাকুরপুকুর জেমস লং সরণির বাসিন্দা সুলগ্না রায় (২৩)। বিদেশি খরিদ্দারদের ক্রেডিট কার্ডের নম্বর ব্যবহার করে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এক মাস ধরে গোপনে প্রায় পৌনে দু'লক্ষ টাকার সামগ্রী কেনা-কাটা করেন ইন্টারনেট ব্যবহারে দক্ষ সুলগ্না সেটাই কাল হয় তার। অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নেমে ঠাকুরপুকুর থানা এলাকা থেকেই সুলগ্নাকে গ্রেফতার করেন লালবাজারের সাইবার অপরাধ দমন শাখার গোয়েন্দারা। গোয়েন্দা সূত্রে জানা যায়, সুলগ্না গ্রাহকদের ক্রেডিট কার্ডের নম্বর জানতেন। সেগুলো গোপনে নিজের কাছে লিখে রাখতেন। পরে সেইসব নম্বরের মাধ্যমে নিজে অন-লাইনে কেনা-কাটা করতেন। ক্যালিফোর্নিয়ার একটি সংস্থার কাছ থেকে অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু হয়। জানা যায় 'ক্যাল ওয়েব ডট কম' নামের ওয়েব সাইটের মারফতই সব কেনা-কাটা

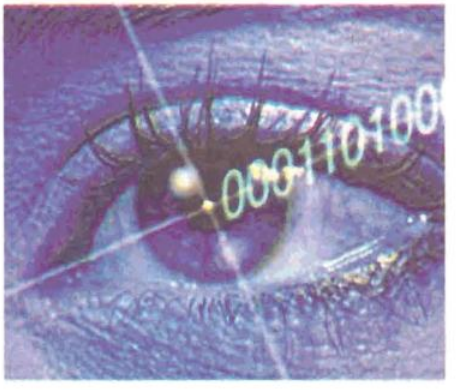

হয়েছে। যার আনুমানিক মূল্য ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। গোয়েন্দারা জানতে পারেন সব জিনিসই গিয়েছে ঠাকুরপুকুরের ঠিকানায়। তার পরেই গোয়েন্দারা সুলগ্নাকে চিহ্নিত করেন। এক মাসে সে কিনেছিল শীতাতপ মেশিন, শাড়ি, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, প্রসাধনী, কানের দুলের মতো নানা দামি জিনিস।

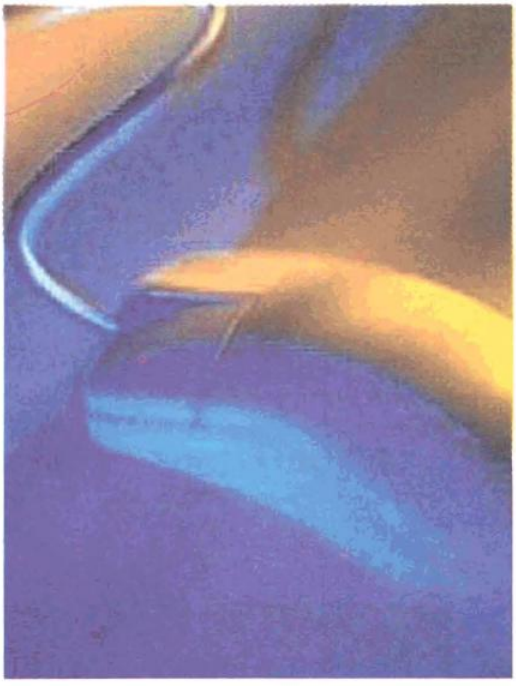

সাম্প্রতিকতম সবথেকে চাঞ্চল্যকর সাইবার অপরাধ বন্ধুত্বের ওয়েব সাইট 'অরকুট ডট কম'-এ মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নকল প্রোফাইল তৈরি করে তাতে উনি 'ডেটিং' করতে ইচ্ছুক—এই জাতীয় তথ্য দেওয়া হয়। বুদ্ধবাবুর প্রোফাইলে 'স্ক্র্যাপ' করে নদিয়ার ডন শ্যামল পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। সংবাদ মাধ্যমে এই খবর প্রকাশিত হলে কলকাতা ও রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দারা একসঙ্গে তদন্তে নামেন। আমেরিকাতে 'অরকুট'-এর জনক সংস্থা 'গুগল'-এর দফতরে যোগাযোগ করে "প্রোফাইল'টি মুছে ফেলার অনুরোধ জানানো হয়। সেইসঙ্গে কোন কম্পিউটার থেকে ওই নকল প্রোফাইল তৈরি হয়েছিল, তার তথ্যও জানাতে বলা হয়। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে গত মাসে সিআইডি খোঁজ পায় সেই ব্যক্তির। সেই 'ব্যক্তি' হল বছর কুড়ি বয়সের প্রযুক্তিবিদ্যা পাঠরত এক ছাত্র। সে নিছক মজা করতে এই কাজ করেছিল। ছাত্রের ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাকে দিয়ে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি এবং মুচলেখা লিখিয়ে ছেড়ে দেন গোয়েন্দারা।

আপনার পাড়া, পাড়ার দোকান, সম্ভবত আপনার বাড়িটিও। অবাক হচ্ছেন! হবেন না। এটা উইকিম্যাপিয়া। শুধু কলকাতা নয়, দিল্লি নয়, গোটা পৃথিবীর স্যাটেলাইট ছবি এ-ভাবে কিলোমিটারের পর কিলোমিটার ধরে রয়েছে উইকিম্যাপিয়াতে। শুধু উইকিম্যাপিয়া নয়, নেটরাজ্যে রয়েছে 'গুগল আর্থ'ও। অনেকটা একই ব্যাপার। জায়গার নাম দিয়ে সার্চ করার অপেক্ষা। বিমান থেকে এলাকা পরিদর্শনের মতোই আপনি দেখতে পাবেন পৃথিবীর যে কোনও প্রান্ত। 'কি হোল' (Keyhole) সংস্থা 'আর্থ ভিউয়ার' নামে প্রথম এই ম্যাপ সার্ভিসটি শুরু করে। পরে গুগল এটিকে কিনে নেয়। এখন গুগল আর্থের সুবাদে গোটা বিশ্বের সমস্তটাই উন্মুক্ত হয়ে উঠবে আপনার সামনে।

আর এখানেই কপালে ভাঁজ পড়েছে গোয়েন্দাদের। কীভাবে, একটা উদাহরণ নেওয়া যাক—

মুম্বইয়ের নাভাল বেস। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম। কিংবা নয়া দিল্লির সংসদ ভবন। সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। ছবি তোলা তো দূর অস্ত্। কিন্তু, প্রযুক্তি ভেঙে দিচ্ছে প্রোটোকল, নিয়মকানুন। স্যাটেলাইট ম্যাপে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন থেকে সেনা ছাউনি, সবই এখন হাতের মুঠোয়। দরকার শুধু একটা কম্পিউটার। আর ইন্টারনেট সংযোগ। তা হলেই উঁকি মারা যাবে আপনার-আমার পাড়ার অলিতে গলিতে। স্যাটেলাইট ছবি আর আধুনিক প্রযুক্তি আচমকাই যে পরিস্থিতি তৈরি করেছে, তাতে পোয়াবারো জঙ্গিদেরও। মাটির উপর যতই প্রহরা থাক, আকাশ তো মুক্ত। আকাশ থেকেই তোলা ছবি পুঙ্খানুপুঙ্খ চিনিয়ে দেবে মহাকরণ, বিধানসভা, রাজভবন বা লালবাজারের অবস্থান। গুগল আর্থ কিংবা উইকিম্যাপিয়া তাই এখন জঙ্গিদের কাছে দুর্দান্ত হোমওয়ার্ক, সাইবার টেররিজম-এর উৎকৃষ্ট উৎস।

সবমিলিয়ে সাইবার সন্ত্রাসের কথা উঠলেই চলে আসছে গুগল আর্থ কিংবা উইকিম্যাপিয়ার নাম। গোয়েন্দারাও বুঝছেন, এগুলোর সৌজন্যেই জঙ্গিদের হাতে অনায়াসে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য চলে যাচ্ছে। ফলে, নাশকতার ব্লু-প্রিন্ট ছকে ফেলাটা অনেক সহজ হয়ে যাচ্ছে। সন্ত্রাসবাদীরা ইচ্ছা করলেই আফগানিস্তান কিংবা বাংলাদেশে বসে দেখে নিতে পারে হাওড়া স্টেশন কিংবা হাওড়া ব্রিজের খুঁটিনাটি। পাকিস্তানের কোনও সাইবার কাফেতে জরিপ করা যাবে মুম্বইয়ের নৌ-ঘাঁটি, এমনকী, নাভাল বেস-এর কোথায় 'আইএনএস বিরাট' দাঁড়িয়ে আছে, কোথায় ডক করা আছে সাবমেরিনগুলো।

সন্ত্রাসবাদীরা বরাবরই পছন্দ করে এ-ধরনের এরিয়াল ভিউ। মিসাইল হানা-ই হোক বা আত্মঘাতী হানাদারি, এলাকার পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র হাতের কাছে থাকলে হামলার ছক হয়ে ওঠে অব্যর্থ। এর আগে গুগল আর্থ এ-ধরনের আকাশচিত্র ওয়েবসাইটে দিয়ে বেশ বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। সে সময় ইন্টারনেটে রাষ্ট্রপতি ভবনের ছবি দেখা যাওয়ায় প্রতিরক্ষা দফতর থেকে আপত্তি জানানো হয়েছিল। কিন্তু, এবার উইকিম্যাপিয়ায় আরও নিখুঁত, আরও সুস্পষ্ট ছবি মিলছে। যদিও এই ম্যাপ সার্ভিসগুলোকে অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার রোখার জন্য আইন তৈরি হয়নি এখনও।

সাভেলিয়েভরা আক্ষরিক অর্থেই ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন বিশ্বকে। সঙ্গে সন্ত্রাসের বাড়তি ভয়কেও।

টুকরো খবর রাজর্ষি দত্তগুপ্ত

ইন্টারনেট মানেই কি ভাইরাসের বাসা?

না, তা নয়। তবে কম্পিউটারে ভাইরাস সংক্রমণের ঘটনা সব থেকে বেশি ঘটে ইন্টারনেট থেকেই। ভাইরাস মানে কোনও জীবাণু নয়। অথচ, রোগ-জীবাণুর মতোই ক্ষতিকর একটি কোড। যার সংক্রমণে কম্পিউটারের ক্ষতি হয়। সাইবার দুনিয়ায় এরকম হাজার-হাজার ওয়েবসাইট রয়েছে, যারা বিনে পয়সায় গান, স্ক্রিনসেভার, পর্নো ছবি ডাউনলোড করার 'অফার' দেয়। এই ডাউনলোড করার সময় আপনার কম্পিউটারে অনুপ্রবেশ করতে পারে ভাইরাস। তাই কম্পিউটারে যেমন 'অ্যান্টি-ভাইরাস' রাখতে হবে, তেমনই বিনা বাছবিচারে কোনও কিছু ডাউনলোড করাও বিপজ্জনক।

অনলাইন শপিং কতটা নিরাপদ? ডেবিট কার্ড বা ক্রেডিট কার্ড দিয়ে কেনাকাটা করলে কোনও সমস্যা হতে পারে?

ইন্টারনেটে কেনাকাটা কখনই 'ফুলপ্রুফ' নয়। নেহাত খুব দরকার না পড়লে ইন্টারনেটে ক্রেডিট কার্ড-এর নম্বর না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। অনেক সাইট দাবি করে তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথাযথ। কিন্তু, অনেক ক্ষেত্রেই এই দাবি ভিত্তিহীন। হালে ডেবিট-ক্রেডিট কার্ড কেনাকাটায় অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। বিদেশে বিশেষ কার্ড রিডার-এর মাধ্যমে ডেবিট-ক্রেডিট কার্ডের ডেটা চুরি করে, জাল কার্ড বানানোর ফলাও কারবার রয়েছে। এদেশে এই উৎপাতের কথা বেশি শোনা যায়নি। অতি সম্প্রতি এই পদ্ধতিতে জাল কার্ড দিয়ে কেনাকাটার অভিযোগ দায়ের হয়েছে কলকাতায়।

ইনবক্স-এ দিনরাত জাঙ্ক মেল আসছে। কী করব?

স্প্যাম গার্ড বা স্প্যাম ব্লকার কাজে লাগান। যে ই-মেলগুলিকে অপ্রয়োজনীয় মনে করছেন, সেগুলো সিলেক্ট করুন। তারপর স্প্যাম-ব্লকার দিয়ে মার্ক করুন। বাড়তি পদক্ষেপ হিসাবে ব্লক সেন্ডারও করতে পারেন।

পাইরেসি রোখার উপায় কী?

আইন আছে, উপায় নেই। প্রতিদিন হাজার-হাজার সিডি, সফটওয়্যার কপি হচ্ছে। চেষ্টা চলছে রোখার। কিন্তু, এই প্রয়াস খুব একটা কার্যকর হতে পারেনি এখনও।

সাইবার স্টকিং রুখতে কী করবেন?

সাইবার দুনিয়াতে অনেকেই এখন শিকার স্টকিং-এর। অর্থাৎ কেউ না কেউ 'ফলো' করছে। কয়েকটা সাবধানতা নিলেই এটা এড়ানো যায়। চ্যাটরুম-এ বা অরকুট-এ কখনওই ফোন নম্বর দেবেন না। ইন্টারনেটে মোবাইল নম্বর দেওয়াটা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। পাশাপাশি কোনও ব্যক্তিগত তথ্য সাইবার দুনিয়াতে একেবারে উজাড় করে দেওয়াটাও খুব কাজের কথা নয়। যখনই কোনও অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি কারও ব্যক্তিগত তথ্য, পছন্দ, পাওয়া-না পাওয়ার কথা জেনে ফেলে, তখনই তার নামে ভুয়ো প্রোফাইল করাটা সম্ভব হয়। একই সঙ্গে চেষ্টা করুন, গ্রুপ ই-মেল-এর জবাব না দিতে।

রো
রোববারের
রামপ্রসাদী

আয় মন বেড়াতে যাবি

সুব্রত মুখোপাধ্যায়

ছয়

বলরাম আড়াল করে বলা ফেনচাটা তার নামটি হলেও আদপে সে রসিক মহাজন। সে একজন নামজাদা কীর্তনওয়ালা। নিবাস হালিসহর-কুমারহট্টে। প্রায় সারা বছর ভরই সে সারা বাংলা চষে বেড়ায় কীর্তন গেয়ে। এমনই চাষকার্য মোতাবেক তার একদিন বায়না পড়ল মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায়। বলা রাজার ধাত বুঝে বিস্তর দণ্ডপাতাদির পর গান ধরল। তার স্বদেশী গান, প্রসাদী কালীকীর্তন।

শ্রীশ্রী কালীকীর্তনের মুখবন্ধ হল—'ভবজলধি-নিমগ্ন-রুগ্‌ণ জনগণ-বিমোচন-করণ-কারণ ভুবন-পালিকা কালিকার গোষ্ঠাদি লীলা বর্ণন।'

গলবস্ত্র বলা ফেনচাটা কীর্তন সভায় করজোড়ে দণ্ডায়মান। দু'ধারে শ্রীখোল, তবল, বেহালা, বাঁশি, মন্দিরা। সঙ্গে জনা কয় দোহার। সভামুখ্য স্বয়ং মহারাজা। সভাপূর্ণ পণ্ডিত, রসিকজন, তোষামোদী ও অন্য পরিজনে।

বলা কণ্ঠ ছাড়ল বাদ্য অনুষঙ্গের পাশাপাশি। আরম্ভ হল 'মায়ের বাল্যলীলা।'

বন্দে শ্রীগুরুদেবকি চরণম্।
অন্ধ পুট খোলে ধ্বন্ধ সব হরণম্।।
জ্ঞানাঞ্জন দেহি অন্ধকি নয়নম্।
বল্লভ নাম শুনায়ত কারণম্।।
কেবল করুণাময় গুরু ভবসিন্ধুতারণম্।
তপন-তনয়-ভয়-বারণ-কারণম্।।
সুচারু চরণদ্বয় হৃদে করি ধারণম্।
প্রসাদ কহিছে হয় মরণের মরণম্।।

গান পথ দেখেছিল রাত্রির প্রথম প্রহরে। যখন সমাপন দেখল, তখন তো নিশা অবসান। সকাল বেলাকার প্রসন্ন রোদ, অলিন্দে অলিন্দে গোলা পায়রার বকবকম্, নহবতখানায় সানাই-এর মুখপাত, এমনই আবহ।

সভাপূর্ণ তাবৎ মানুষের মন বিমোহিত অবস্থার তুঙ্গে। কোথা দিয়ে যে পার হল সদ্য রাতটি। রাত্রি কি দিন এই সব বাখানের দুস্তর বাইরে এই বিগত সময়াবলী। সকলেই নিজ নিজ কপালে চাঁদের আলো দেখছে, এই সকালে, কীর্তনের একটুকরো আখর ধারণ করে।

গান ফুরিয়েছে। আত্মগত আর শ্রান্ত বলা ফেনচাটা উত্তরিয়ে কপালের শ্রমজল মুছে সকলকে নমস্কার করে আসনে বসেছে। সভাময় নিস্তব্ধ মুগ্ধতা ছাড়া আর কোনও উল্লাস নেই। মহারাজ শান্ত কণ্ঠ ক্ষেপে বলে উঠলেন, বলরাম! এতদিন তোমার নাম ফেনচাটা ছিল, এই ক্ষণে আমি তোমার নাম মধুচাটা রাখলাম।

বলরাম আভূমি প্রণিপাত পূর্বক বলল, মহারাজ, আমি কৃতার্থ হলাম। কিন্তু আক্ষেপ এই যে আপনি রাজাধিরাজ হয়ে আমার ফেন ঘুচিয়ে দিলেন, চাটা টুকু ঘোচাতে পারলেন না।

সুরসিক ও গুণদর্শী রাজা বলরামকে যথোপযুক্ত পারিতোষিক প্রদান করলেন। এবং তারপর রাজার প্রকৃত উদ্‌যোগ পর্ব আরম্ভ হল। বলরামের কণ্ঠ ধরেই তিনি সেনজ রামপ্রসাদের তালাশপত্র করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি প্রসাদের কাছে দূত পাঠালেন একটিমাত্র বাসনায়, কবি তাঁর

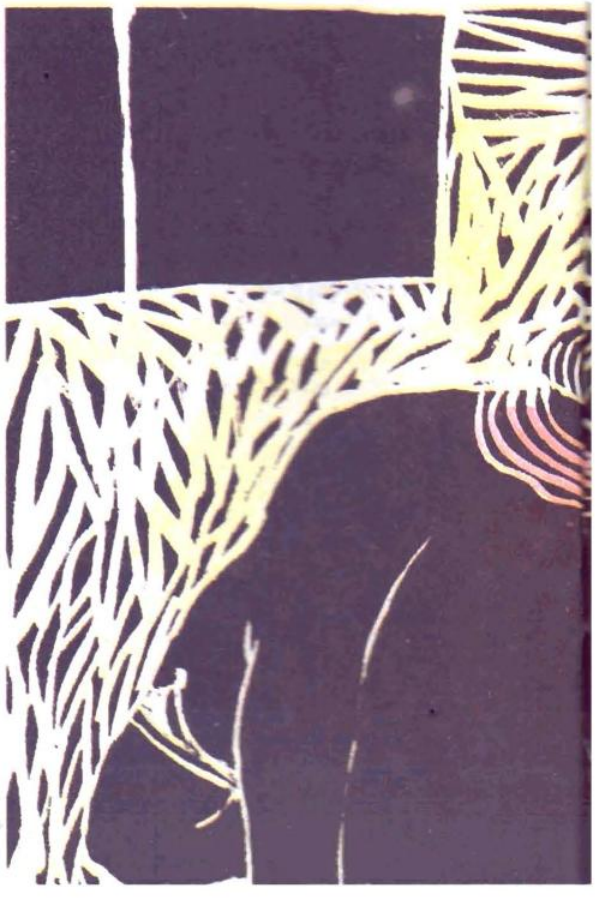

অধীনস্থ রাজসভার সদস্য হোন এবং নিরন্তর রাজসঙ্গে থাকুন। কিন্তু যে মানুষের গলে উড়োপাখির বুনো মালা পরানো আছে জন্ম ইস্তক, সে কি অন্য কারও অধস্তন নিগড়ে বাঁধা রইতে পারে। তার উপর রামপ্রসাদ বিষয় বাসনা থেকে বহু দূরে। তাঁর একমাত্র আসক্তি কবিতা ও কালীকায়। এই দুয়ের কে যে কার পরিপূরক সে রহস্য স্বয়ং প্রসাদেরও অগম। অতএব বুঝি রাজার গুণপিপাসার টানেই দু'জনার মধ্যে সেতু বাঁধা হল। হালিসহর-কুমারহট্টে নদীয়াপতির যে সুরম্য কাছারিবাড়ি আছে সেখানে যখনই তিনি বিষয়কর্মে আসেন তখনই ডাক পড়ে কবির। কখনও বা সেই সঙ্গে আজব ক্ষেপা অযোধ্যানাথ গোস্বামীরও। রাজা শাক্ত ও বৈষ্ণবের মুখোমুখি গীতসমর উপভোগ করেন। সে ভারী রমণীয় যুদ্ধ।

কিন্তু এমন যে সম্পর্ক, সেখানে অতি সামান্যে চিড় ধরতে পারে এক কথা সর্বানী বুঝেছে। আজ সকালে কৃষ্ণনগর থেকে রাজার লোক এসেছিল বাজপেয়ী যজ্ঞে রামপ্রসাদকে নিমন্ত্রণ করতে। তার হাতে ছিল রাজার সীলমোহর আঁটা দস্তখতি পত্র এক। প্রসাদ পত্রখানা খুলে পড়েনওনি। সেই থেকে গোঁজা আছে ঘরের খোড়ো চালের বাতায়।

রাতে দুজনার দেখা হল শয়ন ঘরে। সর্বাণী আর রামপ্রসাদ মুখোমুখি। ঘরের কোলঙ্গায় পিদিম জ্বলছে। বাইরে সবে ঝড় আরম্ভ হয়েছে। বিকেলের মেঘ এখন ঝড়ের পুচ্ছ ধরেছে। সেই সঙ্গে শিলাবৃষ্টিও। বন্ধ দরজার কপাটে আকাশ হতে পাঠানো মেঘ ফুটন্ত পাথরগুলো আছড়াচ্ছে ঘরে ঢুকবে বলে। প্রসাদ শুনছেন কালী রমণীর বিরাট দুই পদে আর চারচার হাতে নূপুর, মল, চুড়ির একত্র বাজনা ঝমাঝম্ ঝমাঝম্, ঠনাঠন্ ঠনাঠন্। ঝড়ের তাড়সে অতর্কিত কোনও ভাবী ঘনঘটার সমাচার। দরজার লোহার কড়াগুলো বেজে চলেছে এ ঘরে সে ঘরে। গোহালে কালো গাইটির সদ্য বাছুরটি ভয়ে ডাক ছাড়ছে। তার বছর বিয়োনি মা জননী ছানাটির সর্বাঙ্গে নিজের জিভ বোলাতে বোলাতে বলছে, ভয় কি রে বাছা। আমি না তোর মা। রামদুলাল আর পরমেশ্বরী সুখে ঘুমোচ্ছে তাদের ঠাকুরমার বিছানায়, পাশের ঘরে। ঝড়ের মুখে কচি আমের গন্ধ ঘুরছে।

সর্বাণী দেখছে তার সুগৌর স্বামীরত্নটির আরক্ত মুখমণ্ডল। হালে ক্ষৌরী হওয়ার পর এখন সুঠাম গালে চিকন চিকন-চকচকে দাড়ির ফুটি ফুটি বাহার। পলকা গোঁফের ছটা। কাঁধ ছোঁয়া বাবরির কুঞ্চিত গুছি। পরণে রক্তরঙা ধুতি বরাবর পুষ্ট জানু ঢাকা। চওড়া বুকে দয়ালু রোমের উপর এক যুগল রুদ্রাক্ষ মালা এলিয়ে রয়েছে। দুই হাতে রুদ্রাক্ষ বালা। এবং বাম হস্তের উপর এলাকায় রূপার পুরু তাবিজ। সর্বাণী দেখছে তার স্বামী দেবটি নিজের প্রতি এত অনাচার আর বেখেয়াল সত্ত্বেও এখনও কি মনমোহন। যদিও বয়স মধ্য ত্রিশ পেরনো তবু দু-বাহুর আঁটনে আর বলিষ্ঠ বাঁধনে-সদাই যৌবন বহাল। লালাভ টানা টানা দু-চোখের ফাঁদে উদাস মদিরা। পুরুষ্টু ঠোঁটে মেটে কার্তিকেয়র ঘাম তেল মাখানো। কোলঙ্গার দীপ আলোয় মহাশয়টির মুখের একপাশ থরথর করছে। রামপ্রসাদ তক্তপোশের ধারে দু-পা ঝুলিয়ে বসে আছেন।

রামপ্রসাদ আরও একবার চমকিত হন। বাইরে গাছের ডাল ভেঙে পড়ার তর্জন এবার অন্তরে ঘটে

সর্বাণী বলে, পান দেব তো?

আনমনা কথা ফেরে, দে একখানা।

দরজার চৌকাঠের ভাঙা আর আলগা অংশ গলে একটুকরো বরফ শিলা হাউই বাজী হয়ে ঘরের মেটে মেঝেয় ঠিনকে পড়ে। প্রসাদ চমকে বলেন, দেখ পাগলী দেখ্।

সর্বাণী হাসে, এ বছর আর আম হল না। সবই বুঝি শিলে খেল।

—কিন্তু প্রকৃতির মার কেমন সেটা দেখলিনে। ফাঁক ফোকর যা পায় সেঁধিয়ে পড়ে।

—কিন্তু তুমি কি পিকিতির বাইরে!

—সে কি কথা!

—এটিই তো আসল কথা গো। সকালে দেখলুম রাজার লোকটিকে তুমি যেন আমলই দিলে না। এটা কি ভাল হল!

—এতে আবার মন্দ ভাল কি!

সর্বাণী একখানা রেকাবির ওপর ডাবর কোলে পানে লম্বা লম্বা আঙুল দিয়ে চুন সাজাতে সাজাতে বলে, মহারাজা বলে কথা। তোমার মুখের জব না পেয়ে লোকটি ফিরে গেল। এখন রাজা কি ভাববেন বল দিকিনি।

ঘরের পিছন বাগে মড়মড়াৎ শব্দে বুঝি বা কোনও গাছের ডাল ভাঙে। ভেঙে পড়ে বুনো ঝোপ ঝাড়ের গায়ে। ফলে জল, বন ঝপাস ঝম বিচিত্র মিশেল হয়ে যায়। সর্বাণী চমকে ওঠে, বেলগাছটার বড়ো ডালখানা পড়ল বুঝি।

—কেন সবেদা গাছের ডালও তো হতে পারে।

সর্বাণী আড় চোখে একবার দেখে তার কর্তাটিকে। তারপর পানটি হাতে করে প্রসাদের মুখের সুমুখে তুলে ধরে, নাও, হাঁ করোসে দিকি খোকা।

প্রসাদ এই প্রথম হাসেন। অসম্বিত প্রায় ভুমি হতে নেমে দাঁড়ান। একটু ঘুরে বসেন রমণীর দিকে। তারপর ডান হাতে তার পিঠে বেড় দিয়ে ধরে আলগা করে আকর্ষণ করেন নিজের দিকে। সর্বাণী বাম হাতে প্রসাদের গাল টিপে ধরে সহজেই হাঁ হয়ে যাওয়া মুখ গহ্বরে পানটি গুঁজে দেয়। প্রসাদ বদ হাসির শোভায় পান চিবোতে চিবোতে বলে ওঠেন, মনে একখানা পদ এল যে।

—আপদ নয় তো।

—আপদ ধরলে আপদ।

—শুনিই না।

—কেহ বলে মরুক গলায় দিয়া দড়ি।
রাতে দিনে পড়ে থাকে দুটা জড়াজড়ি।।
বিয়ারাত্রে দেখিলাম বর চান্দ পারা।
ছুঁড়ির হাঁপানে ছোঁড়া হল তন্তুসারা

সর্বাণীর পিঠে প্রসাদের অপর হাতের বেড় এবার। রমণী বলে, একজোড়া ছেলেপুলের বাপের এমন তত্ব! কাঁঠালের আমসত্ব! বাইরে ঝড় বাদল বলেই কি?

—এ তত্ত্বের ঝড়ও নেই, বাদলও নেই। তবে একেই বলে রমণীবচন সুধা।

—আর। আর কি বলে?

প্রসাদ হেঁট হন সর্বাণীর প্রতি। রমণীর গলার কাছে নিজ মুখ স্থাপন করে বলেন, রমণীরতন। মনে ভার জমলেও তোমার ঠাঁয়ে এলে নেমে দাঁড়ায়।

—মন নামে কিন্তু শরীর দাঁড়িয়ে যায়।

প্রসাদ সর্বাণীকে চুমায় চুমায় অতিষ্ট করে তোলেন।

—তোর পান সাজার ইঙ্গিতটি ভারী মধুর রে পাগলী।

সর্বাণী প্রসাদের বুকে হাত ঠেলার ভান করে, ঘরের মেঝেয় কিন্তু শিলের টুকরোখানা পড়ে আছে। ওটি গলতে সময় লাগবে।

—শিলার কি প্রাণ আছে রে পাগলী?

—সে কথা আমার চেয়ে তুমি তো ভাল জান্যে।

—কেমন করে?

—তুমিই তো বলো শিলা-মাটি জল সবখানে প্রাণ আছে। তা না হলে মায়ের মেটে পিতিমে গড়িয়ে বচ্ছর বচ্ছর পুজো করো কেন?

রামপ্রসাদ আরও একবার চমকিত হন। বাইরে গাছের ডাল ভেঙে পড়ার তর্জন এবার অন্তরে ঘটে। শিল পাথরের সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির গমক বেড়ে চলে। মুহুর্মুহু মেঘ গর্জায়। এমনতর সব শব্দবৃন্দে মনে হয় আরও একবার অতি গোপন মন্ত্রমাহাত্ম্য কখন। কথা হয় মনে মনে, সর্বাণীর পৃষ্ঠ আকর্ষণ করে, এই স্থূল ও সূক্ষ্ম তত্ত্বাত্মক সংসার যাবতীয়ই ব্রহ্মময়। কিন্তু প্রকৃতি ভিন্ন বিশ্বসংসারের রচনা হয় না। প্রকৃতিই সৃষ্টির মূল ও কারণরূপে পরিদৃশ্যমান। এই প্রকৃতির রূপ অনন্ত। আর এই অনন্ত মহিম রূপমধ্যে প্রকৃতির কালীকা রূপই সর্বাপেক্ষা মনোহর। এই কলিযুগে কালীই মানবকুলের ভোগ ও মোক্ষদায়িনী।

কিন্তু এই সর্বাণী, স্বয়ং ভোগের আগুন জ্বেলে দিয়ে কেমন করে নাছ দুয়ার দিয়ে পালিয়ে গেল! কিন্তু এ কথা তো সার যে, মৈথুনেন বিনা মুক্তির্নেতি—মৈথুন ভিন্ন মুক্তি লাভ ঘটে না। তাই তো আগমে বলে বসে আছে, জগন্ময়ী আদ্যাশক্তি হলেন যোনিরূপা। তাঁরই অপর নাম কালীকা।

কিন্তু যিনি কালী, তিনিই ত্রিপুরা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা, তারা, মহালক্ষ্মী, মাতঙ্গী, কমলা, সুন্দরী, ভৈরবী—ইত্যাকারময়ী।

তাহলে প্রসাদের কাছে যদি কবিতা ও কালীকা সমান হয় তাহলে ওই ইত্যাদি সকলের শেষতমে কেন পাগলী সর্বাণী সাব্যস্ত হবে না।

সর্বাণী হাসি মুখে বলে, কি হল খোকার! বুঝি নতুন দেখছে গা!

বিমোহিত রামপ্রসাদ রমণীরতনের স্তনে মুখ রাখেন। দুই সুচারু বিল্বফলের উপত্যকায় ঠোঁট পেতে দেন।

সর্বাণী বাইরের বজ্রপাতের অনুষঙ্গে দু'হাতে সাপটিয়ে ধরেন বীর সন্তানের ঝাঁকড়া মাথা। রামপ্রসাদ ক্ষুধার্ত স্বরে বলে যান, মাটির মূর্তি। মেটে পিতিমে। জ্যান্ত পিতিমে। পাগ্‌লী, পাগ্‌লী, পাগ্‌লী কমনেকার—

বড়মার সুমুখে রামের গ্লাস হাতে দণ্ডায়মান আমার কানুবাবা। পাজামা আর কলার তোলা গেঞ্জি। ট্যাঁকে নস্যির রুমাল।

—তাহলে ঠাকমা তুমি স্বীকার করলে না তোমার স্বামী তান্ত্রিক ক্রিয়া করতে বসে মদ্যপান করতেন।

বাবা ইস্টবেঙ্গল টিমে প্রাক্তন ফুটবলার হেতু একটু উত্তেজিত হলেই কথার সমে ফাঁকে তড়াক তড়াক লম্ফ দিয়ে

বর্ষাফুর্তি সম্ভার
"আগামীকাল বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা।"
শ্রীলেদার্স আছে তো!
60414
Rs. 79/-
শ্রীলেদার্স নিয়ে এলো বর্ষার দারুণ কালেকশন "বর্ষাফুর্তি সম্ভার"।
ফাটাফাটি কালার রেঞ্জ। দাম একদম নাগালের মধ্যেই।
Sreeleathers
বিশ্বমান। খাঁটি দাম।
Genesis 2337

ওঠেন। কলকাতার ফার্স্ট ডিভিশনে বলাই চ্যাটার্জী, শৈলেন মান্নার সমসাময়িক খেলোয়াড় এবং বরাবরই সেন্টার ফরোয়ার্ড। বল নিয়ে একবার এগোলে কার সাধ্যি থামায়। একবার তৎকালীন ঢাকায় খেলতে গিয়ে সেকি দারুণ অভিজ্ঞতা। বাবার বল দৌড় দেখে মহামেডান স্পোর্টিং সমর্থকেরা চিকরে ওঠে, বাইঠ্যাটারে পারাইয়া দে।

বাবা তো আদপে পাঁচ ফিট বড়জোর। দাদু কিন্তু দীর্ঘাকৃতি। কিন্তু স্বভাবে, দাদু অসহায় পরনির্ভরী আর সাত্ত্বিক পণ্ডিত। বাবা তার উল্টোবাগে নিদারুণ স্বাবলম্বী, মহা ক্রোধী আর একেবারে তথাকথিত ম্লেচ্ছ। ফুটবল সত্ত্বেও কিন্তু খোলা গানের গলাটি খাসা। একটুখানি নাকি নাকি, মানে রবীন মজুমদার-সায়গল জাতীয়। গলার সুর আর জোয়ারি দুইই চমৎকার।

বড়মা সন্ধের খাবার আটাভাজা পাকলাতে পাগলাতে আর গলায় ঘটি উপুড় করতে করতে বলেন, তুই যদি হয়কে নয় করিস্, থালে আমি কি করব!

বাবার তিড়িং বা তড়াক্ লাফ্ ঘটে আরও কয়েকবার। সেই সঙ্গে বারকয় নস্য নেওয়া। থালে কে জানবে বলতো ঠাক্মা। তুমি ঠাকুর্দার পরিবার হয়েও কিচ্ছু জানো না! জানবে ওপাড়ার অন্নপিসী!

—ছি ছি। ও কথা বলিসনে। পরিবার ভিন্ন আর কিছু জানতো না মানুষটা।

—ও সব কথা সবাই বলে। রাখো তো। তোমার বড় পুত্র এমন পণ্ডিত, আচারি বিচারি। কিন্তু তার পরেরটি কেন অমন লম্পটস্য লম্পট হলেন।

—ছেড়ে দে না ভাই। সংসারে ভাল কথাটুকু কেবল আঁচলে গেরো দিয়ে রাখতে হয়।

—উঃ ভালোরে ভালো। অমন যার বাপ, অমন যার রামতুল্য দাদা সেই দীননাথ কাকা শুধু নয় আমার কাকীমাটিও তো স্বামী মারা যেতে তেঁতুলে বাগদীর সঙ্গে পালিয়ে গেলেন। তেঁতুল আমাদের গাঁয়েরই শেষমাথায় হাকুলির মার ভিটেয় থাকত। ঘরে চোলাই বানাত।

—দীনু। ছেলেটা কালাজ্বরে মরে গেল টুক করে।

—বাঁচা গেল। তোমার মনে মাছে ঠাক্মা, একবার সম্পত্তির লোভে আমার বাবার হুঁকোয় শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো মিলিয়ে রেখেছিলেন কাকা। একবার টান দিতেই বুক গেল, বুক গেল।

—কি জানি ভাই।

—কি জানি বললেই হল। আর চেহারা চরিত্রেও বাবার সঙ্গে কোনও মিল নেই। একেবারে রঘু ডাকাত, রঘু ডাকাত।

—ওরে তোর গুরুজনরে। অমন করে বলতে নেই।

—নিকুচি করেছে গুরুজনের। কিন্তু তিনি মরেও কি শান্তি আছে। নষ্টা কুলটা যুবতি বউ রেখে গেলেন। তেঁতুলে বাগদী ছিল বাড়ির মাহিন্দর। কাকা জমিদারের নায়েবগিরি করতেন এ দেশ সে দেশে। কালে ভদ্রে দেশে আসতেন। ফলে যা হওয়ার তাই হল।

—হরিবল, হরিবল।

—হুঁ, অনেকে দেখেছে, কাকীমা বাড়ির কুয়োতলায় সন্ধেবেলা গা ধুচ্ছেন। আর তেঁতুল বাগদী তাঁকে সর্বাঙ্গে সাবান মাখিয়ে দিচ্ছেন।

—হরিবল। হরিবল।

—একজোড়া ছেলে, তিনচারটি মেয়ে তোমার ঘাড়ে ফেলে রেখে তোমাদের বৌমা তেঁতুলে বাগদীর হাত ধরে

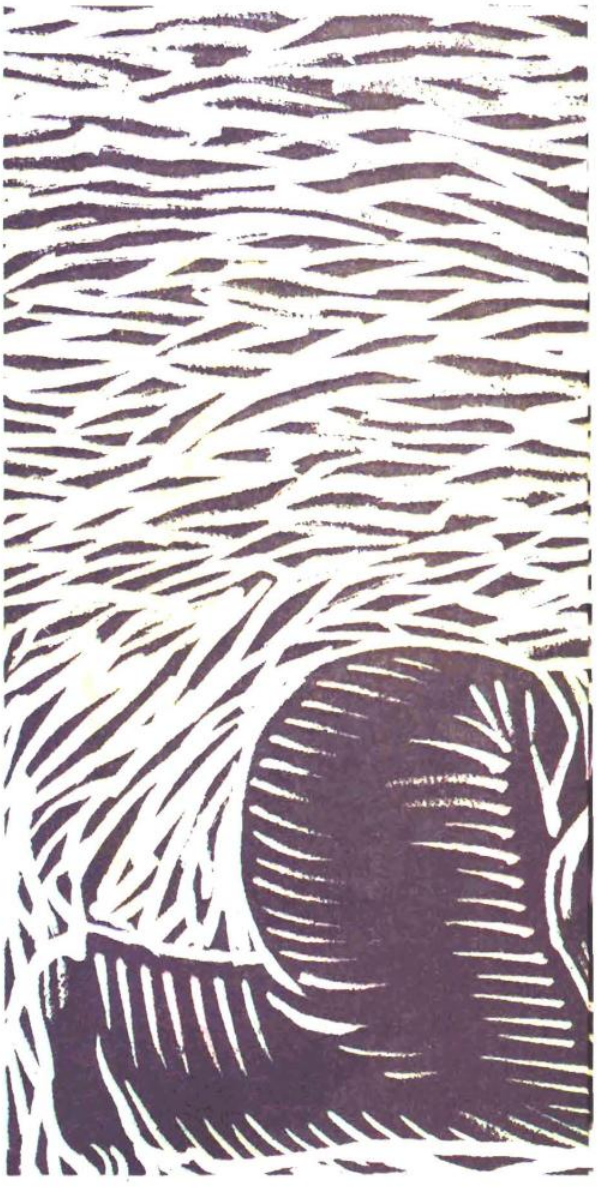

গিয়ে উঠলেন হাকুলির মার ভিটেয়। তারপর চখা-চখি মিলে ধেনো মদের কারবার। সে কি রমরমা।

—হরিবল। হরিবল।

—হরি নয়, কালী কালী বলো ঠাক্মা। তান্ত্রিকের পুত্রবধূ তার ডাকাত ডাকাত পাষণ্ডের বউ। এ না হলে মানাবে কেন। তবু রক্ষে, জন্মনিয়ন্ত্রণটা কায়দা করে করেছিল। বাচ্ছা-কাচ্ছা হয়নি।

মা বারান্দা দিয়ে রান্নাঘরে যেতে যেতে বলে, বাবা, মুখ না নর্দমা।

কানুবাবা গর্জে ওঠেন না, গঙ্গাজল হবে।

মার কথা রান্নাঘরে ভসস্ জলে ফোড়নের তলে হারিয়ে যায়। সেই সঙ্গে ঝাঁঝ। ওদিকে সন্ধে পড়ে বড়মার হাতে ধরা শাঁখে পরপর তিনবার। এই বয়েসে এখনও কি দম।

সদর দরজায় অমনি গম্ভীর গাঢ় গলায় ডাক ওঠে, মা আছিস রে, আমার কমলা মা।

গলার আওয়াজ আমাদের সকলের চেনা। অনেকদিন পর পর আসেন তিনি। শোনা যায় সোহং স্বামীর প্রত্যক্ষ শিষ্য।

ওঁকে দেখলেই বাঘের সঙ্গে লড়াই মনে পড়ে যায়। কোথায় থাকেন, কি খান, কেউ জানে না। লম্বা চওড়া দশাশই কালো রোম বহুল চেহারা। গোলাকার উদর। মাথা নেড়া। আর পরণে গেরুয়া লুঙি, ফতুয়া। কথার টানে বাঁকড়ো ছটা। থাকেন বড়জোর হপ্তাখানেক। আর আমাদের মাকে ভারী স্নেহ করেন। এত বড় সংসার, এক জোড়া বুড়ো-বুড়ি, সাধুসন্ত, অতিথি—সব মা সামলায় একা হাতে। অতিথি সেবা করতে করতে এক একদিন দুপুরে ভাত খাওয়াই হয় না। দাদুর নির্দেশ, বাড়িতে অতিথি এলে আগে তাঁকে দেখশোন করতে হবে। এই সাধুটি—সংসার বিবাগী হলেও আমার মার প্রতি অদ্ভুত মায়া।

বড় মা গলা তুলে ডাকেন, ও মেলা, বলি গেলি কোথায়?

সাধু সামনে এসে দাঁড়ান। কাঁধের ঝোলা থেকে বিড়ির ডিবে বার করেন। তুলে নেন একটি বিড়ি। তারপর সেটি কানের পাশে তুলে ধরে দু-আঙুলে ঘোরাতে ঘোরাতে বলেন, অত বেস্তো হওয়ার কি হল শুনি। মেয়েটিকে কি তোমরা মেরে ফেলবে!

বড় মা ভূমিতে মাথা ঠেকান, পেন্নাম বাবা, পেন্নাম।

আমাদের রামশরণ কাকা এসে পা ছোঁয়। তারপর গলা খাটো করে বলে, আর বোলেন না সাধুজি। এ বাড়ির রীতই অলগ। সবার হুকুম তামিল করবেন ওই বউদি।

সাধু শুধু বলেন, হুমম্।

বাবা সহাস্যে বলে ওঠেন, কিস্যু করার নেই সাধুবাবা। কিস্যু করার নেই। তাহলে আর সংসার কেন বলেছে।

সাধু এ কথার কোনও জবাব না দিয়ে শুধু বলেন, তাহলে রামশরণ, আমি থাকব্য কুথা! দোতালা, না একতালা।

রামশরণ কাকা ওপরে হাত দেখায়, দুতলার বারান্দায় বাবা।

দোতলার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে সাধুবাবা আমার দিকে ঘাড় ঘোরান, কি বাবু। পড়ালিখ্যার খবর তো লিব না। অ্যাকটু গান শুনব্য তোমার মধুর গলায়। মন রে কৃষি কাজ জান না।

ছবি শান্তনু দে

(চলবে)

পথের পাঁচালি

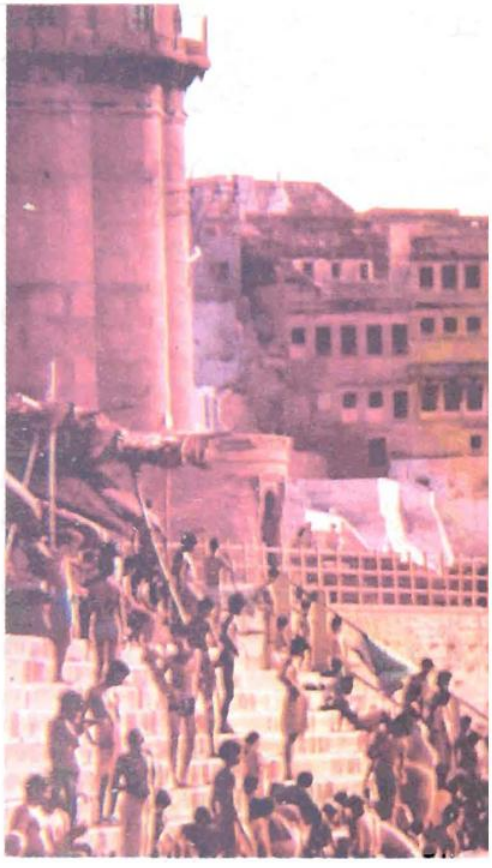

চুন্নু, মুন্নু, ছাদের পাঁচিলের আড্ডা, তেঁতুলের গোলা আচার, কাশীর বাঁদর, বৃষ্টির দিনে ছাতাসুদ্ধ উধাও দাই থেকে ছেলেধরা।
জয়া মিত্র

পাশের বাড়ির ছেলে চুন্নু ছিল তার প্রাণের বন্ধু। একটাই দেওয়ালের দু'পাশে তাদের দুটো বাড়ি। এমন অবিচ্ছিন্ন বাড়ি তখনকার বেনারসে মোটেই অমিল ছিল না। বাড়ি দুটো গায়ে গায়ে হলে কী হবে ঢোকবার রাস্তা দুটো একেবারে ভিন্ন, আর একতলা দোতলা তিনতলাতেও কোথাও মুখ দেখাদেখির উপায় নেই। দেখাদেখির জন্য ছিল কেবলমাত্র ছাদ। বিরাট ছাদের মাঝখানে একটা দু'আড়াই ফুট উঁচু পাঁচিল। তার ওপরে পা ঝুলিয়ে বসে তারা দুই সমবয়সী বন্ধু গল্প করত। কিংবা চুন্নু আসত তাদের ছাদে। যতদূর মনে পড়ে চুন্নুদের ছাদে সে গিয়েছে খুব কম। চুন্নুর মাকে মায়েরা বলে বিনোদদি। আর তারা নিজেরাও বলে তাই। চুন্নুর বাবা মন্না মহারাজ খুব নামকরা পণ্ডিত। তাঁকে সবাই খুব ভয়ও পায়। চুন্নুর বড়দাদা ভাইয়া তাদের দূর থেকে দেখা 'হিরো'। চশমা চোখে, পড়াশোনায় ভাল। ঠিক ওপরের মুন্নু একটু শান্ত। খুব সুন্দর গান করে, তাদের ছাদেও আসে। কিন্তু সে আর চুন্নু সবচেয়ে বেশি বন্ধু। এক আধদিন বিনোদদির রোদে দেওয়া আচার পাহারা দেওয়ার খাজনা হিসেবে একটুখানি আচার চুন্নু নিয়ে আসত। বড় কালো পাথরের খোরায় করে তেঁতুলের গোলা আচার দিদু ছাদে রোদে দিতেন আর তাদের বলতেন বাঁদরের পাহারায় থাকতে, ছোটকাকা দেখাতো যে তার পাশগুলো খোরার গায়ে ঠিক সমান হয়নি। দেখতে ভারি বিচ্ছিরি লাগছে। আঙুল দিয়ে সাবধানে একটু গোলা তুলে নিয়ে সমান করে দেওয়া ভাল। তুলতে গিয়ে আবার সেইদিকটা একটু বেশি নিচু হয়ে গেল, উল্টোদিক থেকে কিছুটা আঙুলে করে চেটে না নিয়ে উপায় নেই। এইভাবে খোরার গায়ে যাতে সবদিক দিয়ে সমানভাবে আচারটা লেগে থাকে সেই চেষ্টা করতে করতে হয়তো গোলাটা অর্ধেক হয়ে যেত, কিন্তু দিদু তো জানেই যে গোলা আচার রোদ্দুরে একটু টেনে যায়। তবে এটা হতে পারত ছোটকাকার নেতৃত্বে। আর আসে সে আর চুন্নু, দুই বন্ধুর প্রিয় খোঁজ ছিল অন্য। পুরনো ছাদের কোণায় কার্ণিশে ছোটছোট গাছ গজাত। ঘনসবুজ হালকা রোমশ পাতা আর এই কুটিকুটি হলুদরঙের ফুল। মাটি-টাটি কিচ্ছু নেই, একটু শুধু চুল পরিমাণ ফাটল, তারমধ্যে থেকে কী করে গজাত গাছগুলো! অনেক অনেক বছর পর মধ্যপ্রদেশে ভীমবেঠকার জঙ্গলে সে দেখবে একটা রুক্ষ বিরাট পাথরের গা ঘেঁষে ওঠা অশত্থগাছ সেই পাথরের গা বেয়ে শিকড় পাঠিয়ে দিয়েছে, অন্তত পাঁচহাত দূরে মাটি ছোঁওয়ার জন্য। আর সেই শেকড় ও পাথরের মাঝখানে সংকীর্ণতম জায়গাটিতে জমে ওঠা জমা এক চিমটি মাটিতে বীজ ফুটে জেগেছে একটি অঙ্কুর। শ্রদ্ধায়, মমতায় এই মাটি, পৃথিবীর মাটিতে মাথা ঠেকাবে সে। জলের পাত্র থেকে এক অঞ্জলি জলের অর্ঘ্যে প্রণাম করবে প্রাণের শক্তিকে। ঠিক সেই অপ্রতিরোধ্য প্রাণ তাদের সেই পুরনো বাড়ির কার্ণিশে ফুটিয়ে তুলত ধানের গমের দানার মতো ছোট ছোট হলুদফুল। তারা দু'জনে সমস্ত ছাদের কোণা খুঁজে খুঁজে সেই ফুলগুলো তুলে মধু চুষে খেত। কলকে ফুলের চেয়েও মিষ্টি। ছাদের এ কিনার ও কিনারের সব ফুল শেষ হলে সাহস একটু বাড়াতে হত। তখন পাঁচিলের বাইরের দিকের কার্ণিশ থেকে একটু ঝুঁকে তুলতে হত মধুফুল। সেটা করা যেত যখন কেবল তারা দু'জনমাত্র ছাদে। কারণটা পরিষ্কার।

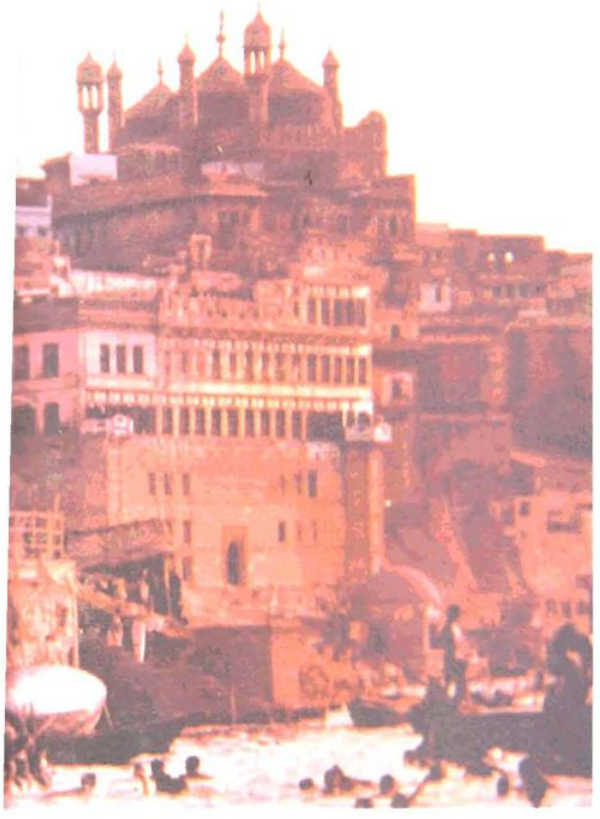

গরমের সময়ে আকাশের আলো কমে এলে পিসি অনেক অনেক জল তুলে পুরো ছাদটা ধুয়ে দিত। তারপর বিছানাপত্র নিচ থেকে এনে ছাদে ফেলে রাখা হত অনেকক্ষণ। যতক্ষণ না 'ছোটদের' শুতে আসবার সময় হয়। মুখ আঁধারি সন্ধ্যেয় দোতলার খাবার বারান্দা থেকে মা বলেছে 'মানুকাকা কলেজ থেকে ফিরে খায়নি। দেখ, তিনতলায় না ছাদে আছে, ডেকে দাও।' দুই বোন 'মানুকাকা, মানুকাকা' ডাকতে ডাকতে তিনতলায় না পেয়ে দৌড়ে ছাদে। অন্ধকারে দেখে ঠাণ্ডা হতে ফেলে রাখা বিছানাপত্রের ওপর মানুকাকা শুয়ে আছে। খানিক ডাকাডাকি করার পরও জাগছে না দেখে গায়ে একটা ধাক্কা দিতেই 'হুপ' করে মস্ত একটা লাফ দিয়ে চুন্নুদের ছাদ হয়ে অন্য ছাদে চলে গেল বিরাট এক বাঁদর! মানুকাকা তো বাড়িতেই ছিল না

কাশীর বাঁদরের যে কত কাণ্ড! শোনা গেল একজন মস্ত জাদুকর নাকি একটা মন্ত্র আবিষ্কার করেছে, যেটা ঠিকমতো উচ্চারণ করলেই সে বাঁদর হয়ে যাচ্ছে। পাশে এক বালতি মন্ত্রপূত জল রাখা থাকছে সেই বাঁদর, যে কিনা আসলে জাদুকর ও মানুষ, তার গায়ে ঠিক সময়মত ওই বালতি ভর্তি জল ঢেলে দিলেই সে আবার মানুষ হয়ে যাবে। এই মানুষ থেকে জাদুকর থেকে বাঁদর থেকে মানুষ কয়েকবার নাকি সে যাতায়াতও করেছে। তার বউ জলভরা বালতি নিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকছিল। কিন্তু একবার বাঁদর হয়ে সেই জাদুকর এত বেশিরকম বাঁদরামি করে ফেলল যে তার বউও ভয় পেয়ে গেল। ভয়ে কেঁপে-টেপে জলটা ঢালবার চেষ্টা করল বটে কিন্তু বাঁদরের ধাক্কায় তার হাত থেকে বালতি গেল পড়ে। কাজেই সেই বাঁদরের আর মানুষ কিংবা জাদুকরে ফেরা হয়নি। কেবল পায়ের পাতা দুটোয় জল লেগেছিল বলে সে হয়ে উঠেছে মানুষের মতো পায়ের পাতাওয়ালা এক সাংঘাতিক রাগী বাঁদর। বিশেষ করে বাচ্চাদের ওপরেই তার রাগ সবচেয়ে বেশি।

কয়েকদিনের জন্য সব ছোটদের স্কুল যাওয়া বন্ধ। বেশ আনন্দেই কাটল সময়টা। তাদের ছুটি ক'দিন বেশি কারণ দিদু নিজের দুই নাতনিকে বাঁদর এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে বাড়ির বাইরে ছাড়বেন না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সব ছুটিই শেষ হয়। স্কুল যাওয়া শুরু হয়। তাদের তখনকার স্কুল ছিল বাড়ির বেশ কাছেই। এই স্কুলে নাকি এক সময়ে মা-ও পড়ত। সকালে তারা গলির মোড়ে মহারাজের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াত আর দাই এসে নিয়ে যেত। রাস্তা থেকে আরও অনেকজনকে নিত দাই। তারপর স্কুলে ঢোকা। ফেরবার সময় ঠিক উল্টো। একসঙ্গে সবাই বেরিয়ে একে একে কমতে কমতে আসা। এক বৃষ্টির দিনে স্কুল থেকে বেরিয়ে একটু এগিয়েই এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখা গেল। সবদিক, সবরাস্তা জলে জলময়। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে সেই জলের ওপর। সবকিছুই কিরকম অচেনা, অবাকমতো লাগছে। বইয়ের ব্যাগ সামলে জলের মধ্যে দিয়ে খপর-খপর করে হাঁটা যে কী মজা! জীবনে এই প্রথম এমন আশ্চর্য কাণ্ড ঘটছে। হঠাৎ সেই জলের নিচে কী করে কে জানে জুতোটা পা থেকে খুলে গেল। নিচু হয়ে এদিক ওদিক পা চালিয়ে আবার যখন জুতোর হদিস পাওয়া গেল, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে প্রথম বোঝা গেল মাথার ওপরে ধরা ছাতাসুদ্ধ দাই অদৃশ্য। এধার ওধার চেয়ে তাকে কোথাও দেখা গেল না। অর্থাৎ কিনা এই বিশাল জলময় ভুবনে তারা দুবোন হারিয়ে গিয়েছে যে পৃথিবীর দিকে দিকে গিজ গিজ করছে ছেলেধরা। তারা এসে এক্ষুনি পিঠের বিরাট বস্তায় ভরে দু'জন নিয়ে চলে যাবে। হাসু-ছানার মতো তাদের ভেজে ভেজে খেয়ে ফেলবে হয়তো। আর কোনওদিন দেখতে পাবে না মা দিদু ছোটকাকা—কারওকে। এত বড় সমাসন্ন সর্বনাশে কী আর করা যায় একটা উঁচু দোকানের সামনের জায়গা, যাকে তারা বলে চৌতারা, সেখানে শুকনো জায়গায় গুছিয়ে বসে কাঁদতে শুরু করা ছাড়া! একটু পরেই দোকানের ভেতর থেকে একটি ছেলে বেরিয়ে এসে শুধোয়,

'কী হয়েছে তোমাদের?'

আমরা হারিয়ে গেছি। এহেন চিত্ত-চমৎকারী ঘোষণার পর সে জানতে চায় আমরা কোথায় থাকি। ঠিকানাটা মা মুখস্থ করিয়েছিল জ্ঞান হওয়ার পর যখন বাবা-দাদু-দিদু-কাকা-পিসিদের সকলের নাম শেখাত, তখন থেকে। দেবেন বীরেন কে হয়?

সোনাকাকা মণিকাকা শুনে তারা মানে তাদের একজন রিকশায় তুলে রওনা হয়। বোনকে কোলে আর আমাকে পাশে বসিয়ে দুজনের হাতে দুটো টফি দিলে বোন তার কোল থেকেই দিদিকে সতর্ক করে 'খাসনা রে দিদি। মনে হয় এরা ছেলেধরা।' যা হোক, সে যাত্রা বাড়িতেই পৌঁছেছিল অবশ্য।

ছবি তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

রো
রোববারের
মেগা

কলকাতায় নবকুমার

সমরেশ মজুমদার

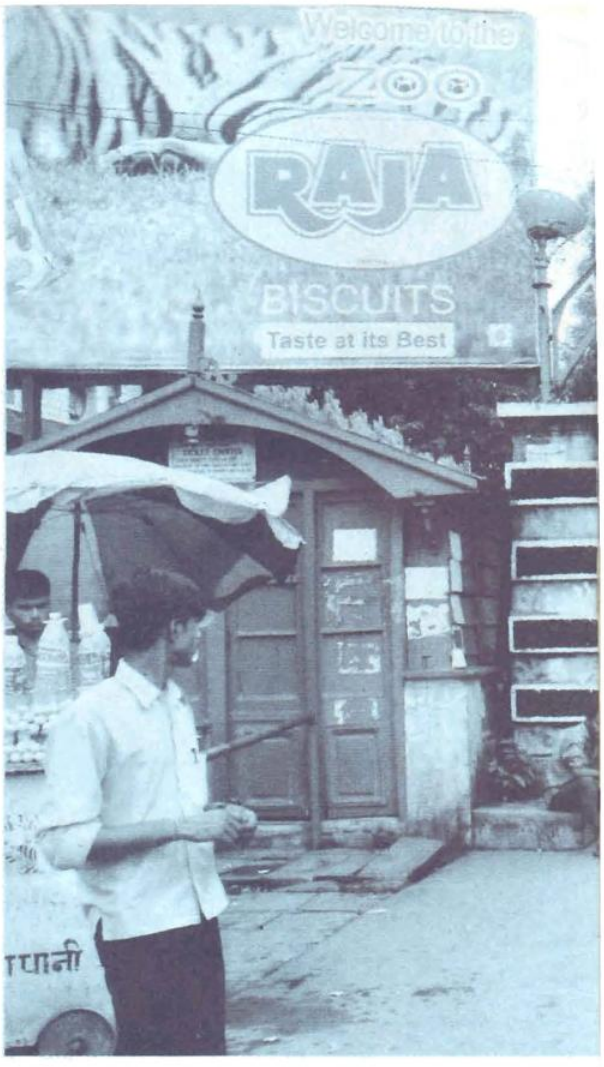

নবকুমার, শেফালি মা আর মুক্তো কলকাতা ভ্রমণে বের হন ট্যাক্সিতে। মনুমেন্ট, গড়ের মাঠ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বেড়িয়ে চিড়িয়াখানায় গিয়ে সেখানে ইতির সঙ্গে দেখা হয়। অন্য একটা ছেলের সঙ্গে বেড়াতে এসেছে সে।

পঁচিশ

চিড়িয়াখানার ভেতরে একটা সুন্দর রেস্টুরেন্ট আছে। শেফালি মা নবকুমারকে নিয়ে সেখানে ঢুকে জানলার পাশের টেবিলে বসলেন। মুক্তোকে টাকা দিয়ে এসেছেন শেফালি মা। সে রেস্টুরেন্টের খাবার খাবে না, পুরি তরকারি কিনে খাবে।

'কী খাবে বলো?' শেফালি মা মেনু কার্ডে চোখ রেখে জিজ্ঞাসা করলেন।

এরকম রেস্টুরেন্টে কখনও ঢোকেনি নবকুমার। গ্রামে এবং গঞ্জের লোকজন ঢোকার সুযোগ পাবে কোত্থেকে? কী খাবার পাওয়া যায় তাও জানা নেই। নবকুমার বলল, 'আপনি যা ভাল মনে করেন—।'

মেনুকার্ড এগিয়ে দিলেন শেফালি মা, 'এটা পড়ে তোমারটা তুমি ঠিক কর।'

আড়ষ্ট হাতে কার্ডটা নিল নবকুমার। ইংরেজিতে লেখা বিভিন্ন খাদ্যের পাশে যে দাম লেখা আছে তা দেখে ঘাবড়ে গেল সে। কোনটাই ষাট টাকার নিচে নেই। কয়েকবার চোখ বুলিয়ে চিকেন চাউমিনটাকেই পছন্দ করল। কলেজে পড়ার সময় ক্যান্টিনে চাউমিন খেয়েছিল কয়েকদিন। খারাপ লাগেনি। কিন্তু ওখানে দাম নিত বারোটাকা। এক প্লেট নিলে দুজনের দিব্যি হয়ে যেত। 'সঙ্গে কী নেবে?'

'কিছু না।'

'লজ্জা করছ কেন? চিলি চিকেন নেবে?'

আর না বলতে পারল না নবকুমার। শেফালি মা দুজনের জন্যে একই খাবার বলে দিলেন বেয়ারাকে। নবকুমার মনে মনে যোগ করে দেখল, অনেক টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে ওঁর।

শেফালি মা বললেন, 'বহুদিন পরে আজ বেশ ভাল লাগছে? ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে প্রতি বছর শীত পড়লেই এখানে আসতাম। তখন এই রেস্টুরেন্টটা ছিল না। তোমার কেমন লাগছে চিড়িয়াখানায় এসে?'

'ভাল।'

'লোকে তো খাঁচায় খাঁচায় জীবজন্তু দেখছে, আর আমি একটা জায়গায় বসে মানুষ দেখছিলাম। মানুষের মতো বিচিত্র প্রাণী বোধহয় আর কিছু নেই।' হাসলেন শেফালি মা, 'ও হ্যাঁ,

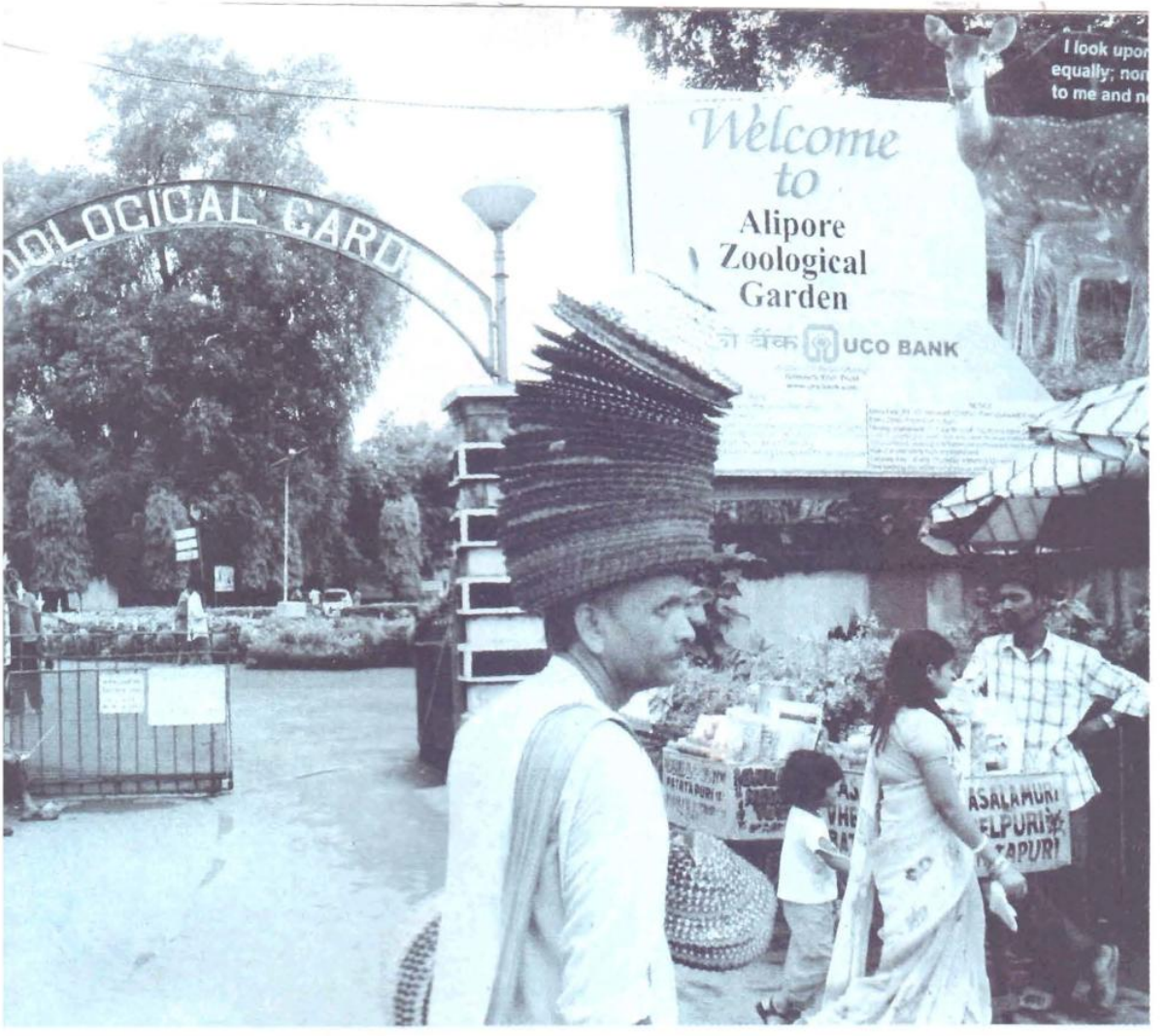

মেয়েটি কে? তোমার দেশের?'

চমকে তাকাল নবকুমার! সে প্রথমে ঠিক ঠাওর করতে পারল না।

'আহা, তোমার সঙ্গে খুব কথা বলছিল যে—!'

'না না। আমাদের দেশের নয়। কলকাতায় আসার সময় ট্রেনে পরিচয় হয়েছিল।'

'তাই?'

'ওর সঙ্গে আত্মীয়স্বজনরাও ছিল।'

'এখানে তো একটা ছেলের সঙ্গে এসেছিল। ছেলেটা কে?'

'আমি জানি না।'

'যখন কোনও মেয়ে অনাত্মীয় ছেলের সঙ্গে চিড়িয়াখানা বেড়াতে আসে তখন বুঝতে হবে ওদের বন্ধুত্ব আছে। অনাত্মীয় বুঝলাম ছেলেটির দাঁড়িয়ে থাকার ধরণ দেখে। তোমার সঙ্গে মেয়েটি কথা বলছিল এটা ওর পছন্দ হচ্ছিল না!' শেফালি মা হাসলেন, 'সাধারণত এসব ক্ষেত্রে পরিচিত মানুষ দেখলে ছেলেমেয়েরা এড়িয়ে যায়। তার ওপর তোমার সঙ্গে ট্রেনে আলাপ যখন, তখন তো সহজেই এড়াতে পারবে। কিন্তু তা না করে সঙ্গীকে দাঁড় করিয়ে রেখে মেয়েটি তোমার সঙ্গে কথা বলেই যাচ্ছিল।' শেফালি মা হাসলেন, 'যেন তুমি ওর খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

'ওর অনেক ছেলে বন্ধু আছে।' মুখ নামাল নবকুমার।

'হুম। তুমি কী করে জানলে?'

'আমাকে বলেছে। ওই ছেলেটাকে ভাল করে চেনে না। বড়লোকের ছেলে, ওকে বিয়ে করতে চায় কিন্তু ও চায় না। অম্বর না কোথায় খাওয়াবে বলে ওর সঙ্গে এসেছে। আমাকেও সেখানে যেতে বলছিল। আমি ওকে ঠিক বুঝতে পারি না।' নবকুমার অকপটে বলল।

'যাক। ইনি তাহলে তোমার কপালকুণ্ডলা নন।'

'মানে?'

'শোন। এই মেয়েটিকে এড়িয়ে চলবে। তোমার ঠিকানা দিয়েছ?'

'হ্যাঁ। গদির নাম্বার। এমন করে বলল যে না বলে পারিনি।'

'বাড়ির নাম্বার?'

'না-না।'

'দিলে দেখতে পাড়াটা জানলে ও আর তোমার সঙ্গে কথা বলত না।'

'পাড়ার জন্যে?'

'হ্যাঁ। বেশ্যাপাড়ায় যে ছেলে থাকে তার সম্পর্কে ভাল ধারণা কেন হবে। অথচ জানো, এই মেয়েগুলো, যারা একের পর একটা ছেলের মাথা ঘোরায়, তাদের পয়সায় দামি

কিন্তু নবকুমার, তুমি শেফালি মায়ের বাড়িতে থাকছ, পয়সা লাগছে না, ঠিক কথা, কিন্তু পরিবেশের কথা যদি তোমার বাবা মা জানতে পারেন তাহলে তো খুব খারাপ ব্যাপার হবে। উনি যদি অভিনয়ে আবার আসেন তাহলে ওঁকে বল কোনও ভদ্রপাড়ায় ফ্ল্যাট ভাড়া করতে

রেস্টুরেন্টে খায়, ভাল উপহার আদায় করে কাটিয়ে দিয়ে আর একজনের সঙ্গে মেশে তারা সোনাগাছির মেয়েদের চেয়ে হাজারগুণে খারাপ। সোনাগাছির মেয়েরা পেটের জন্যে খদ্দের ধরে, কিন্তু তাদের ঠকায় না। আর এইসব তথাকথিত ভদ্রলোকের ভদ্র মেয়েরা মজা লোঠবার জন্যে ছেলেগুলোর সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে অথচ তাদের গায়ে বেশ্যা ছাপ পড়ে না। ছেলেগুলো ওই অভিনয়ে মজে যায় সহজে। যখন বোঝে ঠকে গেছে তখন বেশির ভাগই মুখ বুঁজে সরে যায়, কেউ কেউ অ্যাসিড বাল্ ছোঁড়ে। তুমি যদি ওদের সঙ্গে যেতে রাজি হতে তাহলে রেস্টুরেন্টে গিয়ে মেয়েটা একই সঙ্গে তোমাদের দুজনের সঙ্গে ফস্টিনস্টি করত। ছিঃ!' শেফালি মায়ের কথা শেষ হওয়ার পর খাবার এল।

খেতে আরম্ভ করে নবকুমার বুঝতে পারল, কলেজের ক্যান্টিনে চাউমিন নামক যে খাবার খেয়েছে সেটা খুবই নিচুস্তরের। এত ভাল এবং সুস্বাদু খাবার সে কখনও খায়নি। এরপরে নিজের পয়সায় খেতে হলে তাকে অনেক রোজগার করতে হবে। প্রম্পটারের চাকরি করে সেটা সম্ভব নয়।

খেতে খেতে শেফালি মা বললেন, 'অনেকদিন পরে আজ বেশ ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে এতদিন একটা অন্ধকার ঘরে মুখ লুকিয়ে বসেছিলাম, আজ বেরিয়ে এলাম। তুমি যদি আমার বাড়িতে না আসতে তাহলে আজকের আনন্দটা পেতাম না।'

নবকুমার খুশি হল। কিন্তু সে বুঝতে পারল না, এমন কিছু করেছে কি না যার জন্যে শেফালি মা বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসেছেন।

শেফালি মা বললেন, 'তুমি কি বল, আমার আবার অভিনয় করা উচিত?'

'আপনার অভিনয় আমি কখনও দেখিনি। কিন্তু খুব প্রশংসা শুনেছি। যদি শরীর ভাল থাকে তাহলে—।' কথা শেষ করল না নবকুমার।

'দ্যাখো, মন ভেঙে গেলে শরীর নষ্ট হয়। ভেবেছিলাম শুয়ে বসে বাকি জীবনটা কোনওমতে পার করে দেব। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে মিছিমিছি নিজেকে নষ্ট করার জন্যে ব্যস্ত ছিলাম। ভুল করেছিলাম।' খাবারের বিল মিটিয়ে দিলেন শেফালি মা। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে। একটু ভদ্র ব্যবহার করি। তুমি আজ যাত্রাদলের মালিকের সঙ্গে দেখা করে বলবে কাল দুপুরে, এই ধরো তিনটের সময় পার্ক স্ট্রিটে ফ্লুরিস রেস্টুরেন্টে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে পারি। মনে থাকবে তো, পার্ক স্ট্রিটে ফ্লুরিস রেস্টুরেন্টে বিকেল তিনটের সময়।'

মনে মনে নামগুলো আওড়ে নিল নবকুমার। মনে হচ্ছিল একটি মহান কাজ তার মাধ্যমে হতে চলেছে।

আজ রবিবার। ছুটির দিন। বিকেল পাঁচটায় গদিতে এসে নবকুমার দেখল সব ফাঁকা। গদিতে কেউ নেই। মাস্টারদার দেখা পেল না সে। দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল বড়বাবু ছুটির দিনে গদিতে আসেন না। তাঁর ঠিকানা জিজ্ঞাসা করতে লোকটা একটা ফোন নাম্বার বলতে পারল। গদির ফোনটা তালাচাবি দেওয়া থাকে। বড়বাবুকে খুব জরুরি খবর দিতে হবে বলায় দারোয়ান ফোনের তালা খুলে দিল।

ডায়াল করল নবকুমার। তিনবার রিং হওয়ার পর বাজখাঁই গলা শুনতে পেল, 'হ্যালো!'

'বড়বাবু আছেন? আমি নবকুমার কথা বলছি।'

'কে নবকুমার?' বেশ গম্ভীর গলা।

'আজ্ঞে, আমি, আমি প্রম্পটারের কাজ করছি।' ভয়ে ভয়ে বলল সে।

'অ। কী ব্যাপার? ফোন করছ কেন?'

'আজ্ঞে, শেফালি মা আপনাকে একটা খবর দিয়েছেন।'

'ও। কোত্থেকে বলছ?'

'গদির টেলিফোন থেকে।'

'আমার বাড়িতে চলে এসো। বাগবাজারের মদনমোহন মন্দিরের সামনে একমাত্র গেটওয়ালা বাড়িটা আমার।' ফোন রেখে দিলেন বড়বাবু।

বেশ নার্ভাস হয়ে দারোয়ানের কাছে বাগবাজারের মদনমোহন মন্দিরের হদিশ জেনে নিয়ে হাঁটা শুরু করল সে। চিৎপুরের ট্রাম রাস্তা ধরে হেঁটে সেখানে পৌঁছাতে বেশি সময় লাগল না। গেটের সামনে দাঁড়াতে একটা বিহারী দারোয়ান জিজ্ঞাসা করল, 'নাম?'

'নবকুমার।'

'অন্দর যাইয়ে।'

ভেতরে ফুলের বাগান। মাঝখানে সুন্দর রাস্তা। একটা গাড়ি বারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে আছে। সিঁড়ি ভেঙে বারান্দায় উঠতেই ধুতি আর গেঞ্জি পরা একটা লোক বলল, 'আপনি নবকুমারবাবু?'

নবকুমার মাথা নাড়তেই লোকটা বলল, 'আসুন।'

দোতলায় উঠে বড়বাবুকে দেখতে পেল সে। একটা পাদানিওয়ালা ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে আছেন। তাঁর পাশের চেয়ারে বসে আছে খুব সুন্দর একটা মেয়ে। মেয়েটির পরণে স্কার্ট। মুখ ঘুরিয়ে বড়বাবু বললেন, 'এসো হে। বসো।'

সামনে পড়ে থাকা মোড়ায় বসল নবকুমার।

'শেষ পর্যন্ত কী কথা হল?'

'আজ্ঞে, উনি কাল বিকেল তিনটের সময় দেখা করবেন।'

'বাঃ। কোথায়? গদিতে আসছেন নাকি?'

'না। পার্ক স্ট্রিটের', বলেই আটকে গেল নবকুমার। কিছুতেই নামটা মনে আসছে না। কেবলই প্যারিস প্যারিস বলে মনে হচ্ছে।

'পার্ক স্ট্রিটের কোথায়? কোন রেস্টুরেন্টে?' বড়বাবু সোজা হয়ে বসলেন।

'প্যারিস।'

'প্যারিস নামে কোনও রেস্টুরেন্ট সেখানে নেই। কি রে, আছে?' বড়বাবু মেয়েটির দিকে তাকালেন। মেয়েটি বলল, 'মুখ দেখেই তো বোঝা যাচ্ছে ভুল বলছেন।'

'আঃ। নবকুমার, তুমি নামটাও মনে রাখতে পারনি।' বড়বাবু বললেন।

মেয়েটি হাসল, 'বাবা মনে হচ্ছে উনি ফ্লুরিস রেস্টুরেন্টের নামটা ভুলে গেছেন।'

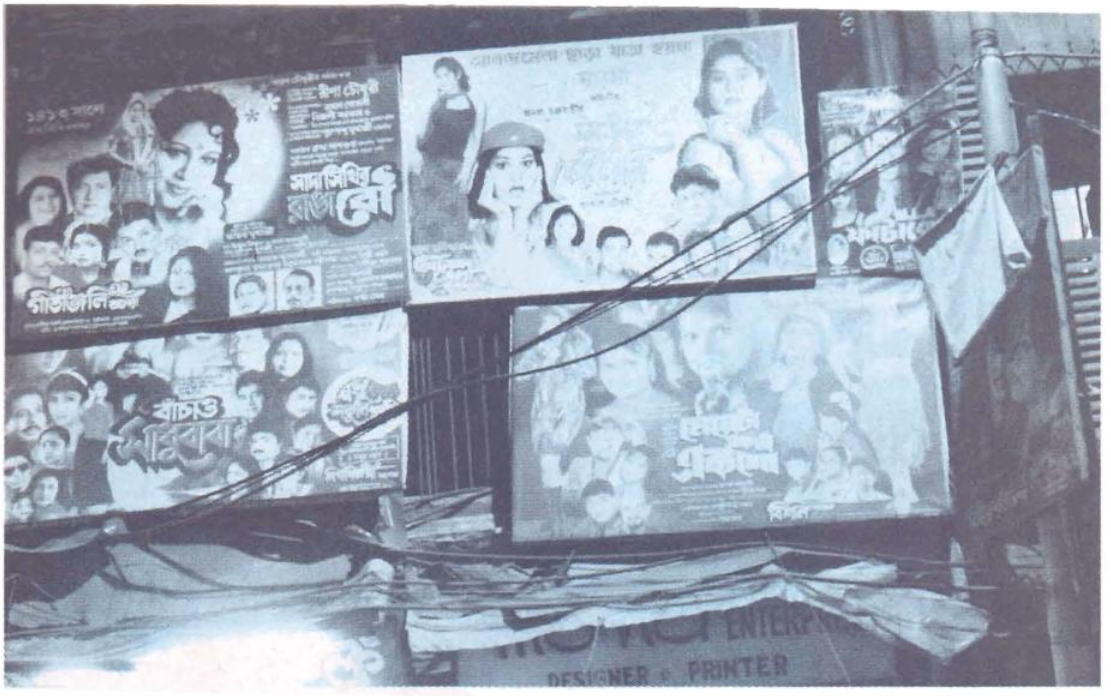

নবকুমারের মনে পড়ে গেল। সে দ্রুত বলে উঠল, 'হ্যাঁ, ফ্লুরিস।'

মেয়েটি বলল, 'ওখানকার কেক খাননি বোধহয়।'

'না। আমি কলিকাতায় বেশিদিন আসিনি।' নবকুমার বলতেই মেয়েটি মনোহর হেসে উঠল, 'কলিকাতা? সেটা কোথায়?'

বড়বাবু বিরক্ত হলেন, 'আঃ। কী হচ্ছে! সুতানটি, গোবিন্দপুর আর কলিকাতা। এই তো ছিল জব চার্নকের আমলে। শেষে তিনে মিলে হল কলিকাতা। তারপর সাহেবরা সেটাকে উচ্চারণ করল, ক্যালকাটা। তার বাংলা হল, কলকাতা বা কোলকাতা। গ্রাম বাংলায় যদি এখনও কেউ কলিকাতা বলে তাহলে তো সে ভুল বলছে না। হ্যাঁ নবকুমার, তুমি ওঁকে বলো যে আমি ঠিক তিনটের সময় ওখানে পৌঁছে যাব।'

নবকুমার মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়াচ্ছিল কিন্তু বড়বাবু বললেন, 'বসো।'

নবকুমার আবার বসল।

'ওঁর সঙ্গে কেউ থাকবেন?'

খুব সাহস করে নবকুমার বলল, 'যদি আমাকে সঙ্গে যেতে বলেন তাহলে মুশকিল হবে। কাল তো একটা থেকে রিহার্সাল।'

মাথা নাড়লেন বড়বাবু, 'না। রিহার্সালে যেতে হবে না। আমি সুধাকান্তবাবুকে বলে দিলে তিনি ম্যানেজ করে নেবেন। মনে হচ্ছে তুমি শেফালিদেবীর নেকনজরে পড়ে গেছ?'

'আমাকে উনি পছন্দ করেন।'

'কিন্তু মনে রেখো, তুমি আমার লোক। কথাবার্তার সময় যদি উনি রাজি না হন তাহলে তোমাকে উদ্যোগী হয়ে ওঁকে রাজি করাতে হবে। মানুমা, গিরীশকে বলো নবকুমারের জলখাবার নিয়ে আসতে।' বড়বাবু বলতেই মেয়েটি চলে গেল। বড়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাড়িতে কে কে আছেন?'

'মা আর বাবা।'

'বাবা কী করেন?'

'জমিজমা দেখাশোনা, চাষ—!'

'তুমি তো গ্র্যাজুয়েট। আর পড়লে না কেন?'

'ভাল রেজাল্ট হয়নি। টাকারও অভাব ছিল।'

'হুম। কিন্তু নবকুমার, তুমি শেফালি মায়ের বাড়িতে থাকছ, পয়সা লাগছে না, ঠিক কথা, কিন্তু পরিবেশের কথা যদি তোমার বাবা মা জানতে পারেন তাহলে তো খুব খারাপ ব্যাপার হবে। উনি যদি অভিনয়ে আবার আসেন তাহলে ওঁকে বলো কোনও ভদ্রপাড়ায় ফ্ল্যাট ভাড়া করতে। এ ব্যাপারে আমার কথা বলা ঠিক নয় তবে উনি চাইলে আমি ব্যবস্থা করে দিতে পারি। সেখানে ওঁর কাছে থাকতে পারবে তুমি।' বড়বাবু বেশ বুঝিয়ে বললেন কথাগুলো।

'বলব।'

একজন কাজের লোক জলখাবার নিয়ে এল ট্রেতে। একটা টুলের ওপর সেটা রেখে চলে যেতে বড়বাবু বললেন, 'খেয়ে নাও।'

নবকুমার দেখল গোটা আটেক ফুলকো লুচি, বেগুনভাজা, আলুভাজা আর দুটো রসগোল্লা প্লেটের ওপর রয়েছে। বড়বাবু উঠে দাঁড়ালেন, 'লজ্জা করো না। আমি সবাইকে বাড়িতে এলেই এসব খাওয়াই না। তোমার মাস্টার তো ওপরে ওঠার সাহস পায় না। খাও।' বড়বাবু চলে গেলেন।

চিনে খাবার হজম হয়ে গিয়েছিল তখন। ক্ষিদে পাচ্ছিল তার। তাই সঙ্কোচ না করে হাত বাড়াল। বিশাল বারান্দায় একা বসে বসে লুচিগুলো বেগুনভাজা আর আলুভাজার সঙ্গে পেটে চালান করছিল নবকুমার নিঃশব্দে। হঠাৎ পেছন থেকে মেয়েটির গলা কানে এল, 'চা খাবেন কি?'

দ্রুত মাথা নাড়ল নবকুমার, 'না।' খাবার মুখে থাকায় কথা স্পষ্ট হল না।

'জল খান, নইলে গলায় আটকে যাবে, বলে মেয়েটি পরীর মতো পাশের ঘরে ঢুকে গেল।'

পরের এপিসোড আগামী রোববার

ছবি তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

গল্প : সত্যজিৎ রায় **উপদেষ্টা** : সন্দীপ রায় **কমিকস** : অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

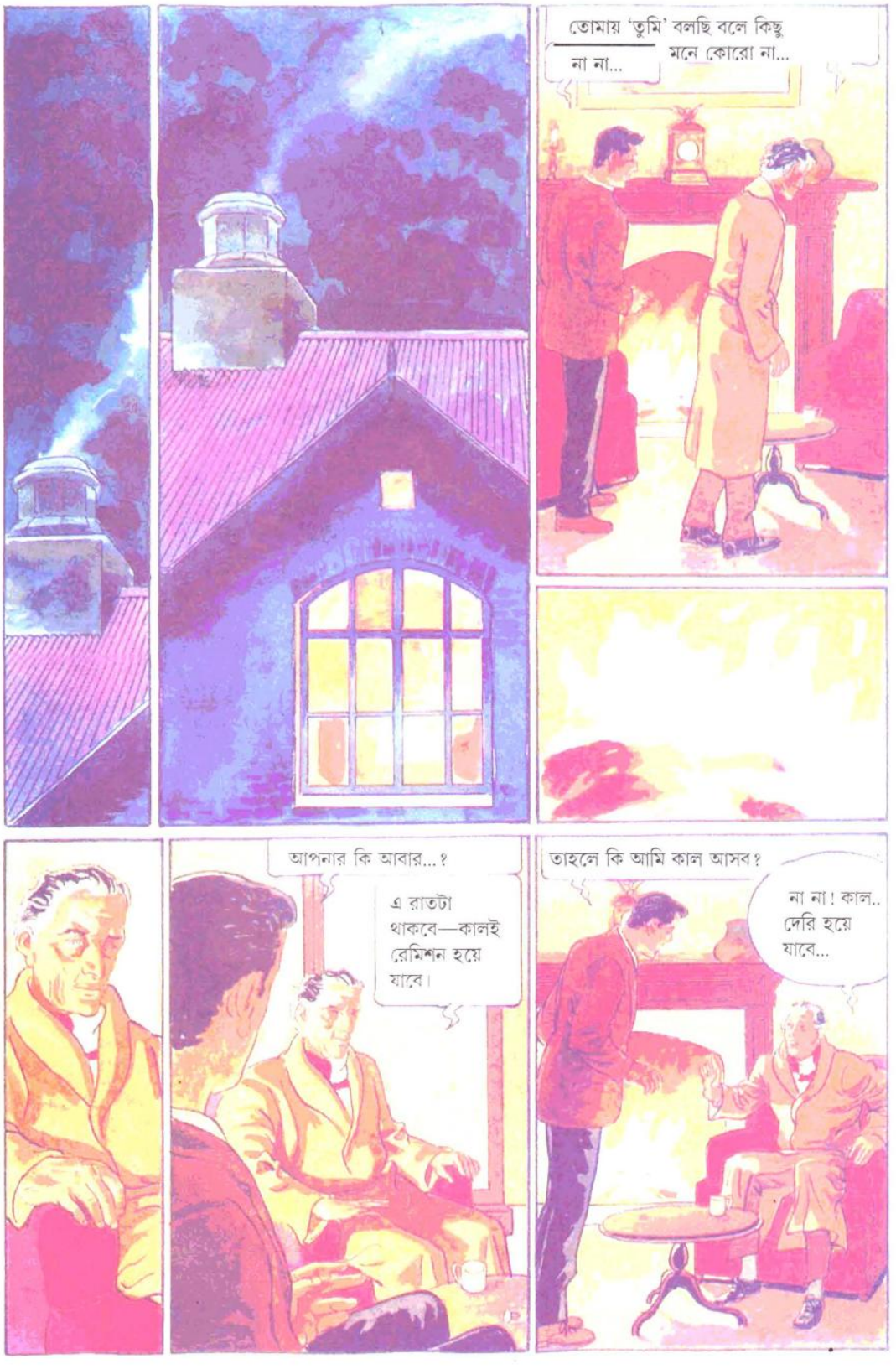

আমার সংগ্রহে আজই দুটো জিনিস যোগ হয়েছে। সেগুলো তোমায় দেখাতে চাই।
একদিনে দুটো!
দুটো। প্রথমটি হল—এই...এই আংটি...
বাঃ! এটা কোথায় পেলেন?
সকালে জলাপাহাড় রোডের দিকটা হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। বিশ্রাম নিতে একটু বসি...

একটা পান দেখি

চলবে

সে

সেন
সলিউশনস

হাত বাড়ালেই রাইমা। খুচখাচ ঝামেলা, টুকটাক সমাধান। একটু বন্ধুত্ব আর অনেকটা বিশ্বাস। চিন্তা কিসের, আপনার কাছে রাইমা আছে

আমি দশম শ্রেণির ছাত্র। মাধ্যমিক পরীক্ষার পর পারফর্মিং আর্ট শেখার জন্য মমতা শঙ্করের 'উদয়ন'-এ ভর্তি হওয়ার ইচ্ছা আছে। আমার প্রশ্ন হল, এখান থেকে ভবিষ্যতে কোনও কর্ম সংস্থানের সুযোগ আছে কি? থাকলেও সেটা কেমন ভাবে? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। দিদি প্লিজ হেল্প।

—চয়ন রায়, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

'উদয়ন'-এ প্লেসমেন্ট-এর সুযোগ দেওয়া হয় কি না, সেটা আমি কী করে বলব? তুমি যখন ডিটারমাইন্ড যে, ওখানেই অ্যাডমিশন নেবে তাহলে ওই সেন্টারেই ফোন করে প্লেসমেন্ট-এর কথা জিজ্ঞাসা করে নাও না? আমি বেশিরভাগ সময়ই মুম্বই-এ থাকি, সেক্ষেত্রে সব বিষয়ে খোঁজ রাখা তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আই হোপ, তোমাকে বোঝাতে পারলাম!

আমি গ্রামে থাকি। এ বছর কলেজে ভর্তি হয়েছি। বাড়ি থেকে কলেজ অনেক দূরে। আমার চোখে মাইনাস পাওয়ার। রোদে বেরলে, চোখে খুব কষ্ট হয়। চশমার জন্য সানগ্লাস পরতে পারি না। প্লিজ হেল্প।

—রিয়া সরকার, বাগনান, হাওড়া

তুমি একটা কাজ করো। তুমি পোলারয়েড গ্লাস দিয়ে চশমা বানিয়ে নাও। এছাড়াও, তোমার পছন্দমতো সানগ্লাস কিনে কোনও চশমার দোকানে গিয়ে পাওয়ার দিয়ে চশমা বানিয়ে নিতে পারো । তবে এগুলোতে যদি অসুবিধা হয় তাহলে তুমি লেন্স পরে সানগ্লাস পরতে পারো! এর চেয়ে বেশি অপশন দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়!

আমি খুব গরিব। সিনেমাতে অভিনয় করার খুব ইচ্ছা। কিন্তু আমি অভিনয়ের 'অ' জানিনা। তুমি প্লিজ আমাকে এ ব্যাপারে হেল্প করো। আর একটা ব্যাপার হল, আমি প্রসেনজিৎ-এর খুব ভক্ত। তুমি যদি ওর মোবাইল নম্বরটা আমায় দাও, তাহলে খুব উপকৃত হব।

—সোমনাথ সর্দার, সোনারপুর

প্রথমেই বলি, আমার পক্ষে কখনওই এভাবে কারওর ব্যক্তিগত নম্বর দেওয়া সম্ভব নয়। সরি। আর অ্যাকটিং-এর ব্যাপারে বলি, এটা শিখতে গেলে কলকাতায় যে সমস্ত অ্যাকটিং ইনস্টিটিউট আছে সেখানে যোগাযোগ করতে পারো। জেনারেলি অ্যাকটিং শেখার পর পোর্টফোলিও বানিয়ে প্রোডাকশন হাউজ-এ পাঠাতে হয়। তবে এগুলো সবই খরচসাপেক্ষ ব্যাপার। এবার ডিসিশনটা তোমাকেই নিতে হবে, যে তুমি কী করবে!

আমি দশম শ্রেণির ছাত্র। সমস্যা হল, রাত ন'টা থেকে বারোটার মধ্যে আমার ঘুম পায়। আবার বারোটার পর থেকে ঘুম চলে যায়। ফলে আমার পড়াশোনায় ব্যাঘাত

ঘটছে। আমি খুব চিন্তায় আছি, সামনেই মাধ্যমিক। প্লিজ হেল্প মি।

—এম এম আলম, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

তোমার ঘুম পেলে আমি কী করতে পারি! একটা কাজ করো। রাত ন'টা থেকে বারোটার মধ্যে যখন ঘুম পায় তখন ওই সময়টা ঘুমিয়ে নিয়ে বাকি সময়টা পড়াশোনা করে নাও। রাতে পড়াশোনা করলে কিন্তু পড়াটা ভাল হয়। তবে তারজন্য নিজেকেও উদ্যোগটা নিতে হবে। সারাদিনে একটা নির্দিষ্ট সময় ঠিক করে নাও পড়াশোনা করার জন্য, কেমন!

আমার বয়স তেইশ। ভাইয়ের একুশ। আমরা ঠিক করেছি, মৃত্যুর পর দেহ-দান করব। সমস্যা হচ্ছে, এ ব্যাপারে কোথায় যোগাযোগ করতে হবে, কিছুই জানিনা। তুমি যদি সেখানকার ঠিকানা ও ফোন নম্বর জানাও, তাহলে খুব ভাল হয়।

—দেবাশিস বর্মন, সুন্দরবন

আচ্ছা, আমি একজন অ্যাকট্রেস, কী করে তোমাকে এই ব্যাপারে ইনফরমেশন দেব? আমি শুধু জানি, মেডিক্যাল কলেজ বা এই ধরনের কোনও হসপিটাল-এ হয়তো দেহ-দান হয়। এই ব্যাপারটায় আমি খুব একটা সিওর নই। তুমি পেপার, ম্যাগাজিন ফলো করো, সেখানে তুমি হয়তো এই ধরনের ইনফরমেশন পেয়ে যাবে। এর থেকে বেশি আমি সাহায্য করতে পারব না।

আমার সামনে বিয়ে। আমার উড বি হ্যাজব্যান্ড বাঙালি। কিন্তু আমি সাউথ ইন্ডিয়ান। যদিও আমি বাংলা পড়তে পারি, লিখতেও পারি। সমস্যা হল, বলতে পারি না। আর একটা সমস্যা হল, আমি কোনওদিন শাড়ি পরিনি। শাড়ি পরতে ভালবাসলেও পরতে পারি না। কিন্তু সবসময় কি শ্বশুরবাড়িতে সালোয়ার কামিজ পরে থাকা যায়? আর একটা ব্যাপার হল, শাড়ির কালার নিয়েও আমার যথেষ্ট কনফিউশন আছে। কারণ আমার গায়ের রং মাঝারি। প্লিজ হেল্প মি।

—অনুপমা রাও, ঢাকুরিয়া

আপনি যখন বাংলা লিখতে পারেন, পড়তেও পারেন—আই হোপ, শ্বশুরবাড়ি গেলে বাংলা বলতেও কোনও প্রবলেম হবে না। সবাই যখন বাংলায় কথা বলবেন তখন শুনে শুনে আপনারও প্র্যাকটিস হয়ে যাবে।

আমি বিএ দ্বিতীয় বর্ষের পাস কোর্স-এর ছাত্রী। আমার প্রশ্ন, এয়ার হস্টেস এবং গ্রাউন্ড হস্টেস হতে গেলে কি সায়েন্স নিয়ে পড়াটা জরুরি? এছাড়া, জার্নালিজম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন পড়তে গেলেও কি সায়েন্স নিয়ে পড়তে হবে?

—পিঙ্কি সাহা, হরিপাল, হুগলি

তুমি প্রথমে ডিসাইড করো কোনটা নিয়ে পড়বে। তারপর, গ্র্যাজুয়ালি প্ল্যানিং করে এগোলে ভাল হবে। এয়ার হস্টেস বা গ্রাউন্ড হস্টেস হতে গেলে যেকোনও সাবজেক্ট-এ গ্র্যাজুয়েট হলেই হবে। তবে অবশ্যই সেটা কোনও রিকগনাইজড ইউনিভার্সিটি থেকে হতে হবে। আর জার্নালিজম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন-এর ক্ষেত্রে সায়েন্স নিয়ে পড়ার তো কোনও প্রয়োজনই নেই। তবে যাই পড় না কেন, ইংরেজিতে নলেজ থাকাটা কিন্তু খুব ইমপরট্যান্ট। আফটার গ্র্যাজুয়েশন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন জার্নালিজম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন অথবা এমএ ইন জার্নালিজম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশনও করতে পারো।

তবে সেটা ডিপেন্ড করবে, আপনার শেখার আগ্রহের উপরে আর একটা প্রবলেমের কথা যে আপনি বললেন—আপনি শাড়ি পরতে পারেন না, এটা কোনও প্রবলেমই না। শাড়ি পরা যে কেউ শিখিয়ে দিতে পারে। আর কালারের ব্যাপারে বলি, যে কোনও ব্রাইট কালার যেমন, বারগান্ডি, স্কারলেট রেড এবং অরেঞ্জ—এগুলো পরতে পারেন। এছাড়াও ব্রোঞ্জ, গোল্ড, আইভরি, কপার উইল লুক চিক অ্যান্ড ক্লাসি। সো গো আহেড, মেক দ্য ম্যারেড লাইফ কালারফুল।

এই ঠিকানায় লিখো—সেন সলিউশনস, রোববার, সংবাদ প্রতিদিন ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭২

রা
রান্নাঘরে
রেস্তোরাঁ

গুপ্তকথা খুলে আম

আকারে আম, প্রকারে কুলফি। আঁটি ছাড়াও একশো শতাংশ খাঁটি। প্লেটে ফেলে রাখবেন না, গলে যাবে।
রিংকা চক্রবর্তী

"অমলাশঙ্কর যখন বাল্যকালে তাঁর বাবা ইকনমিক জুয়েলারির অক্ষয় নন্দীর সঙ্গে বিদেশে প্রথম যান, তখন একজন ফরাসি বৃদ্ধা তাঁকে শুকনো আমের আঁটি দেখিয়ে বলেছিলেন—এই দেখ, তোমাদের ভারতবর্ষের ফলের বিচি যার তুল্য ফল জীবনে আর খাইনি।"

কল্যাণী দত্তের লেখা 'থোড় বড়ি খাড়া'-তে আম নিয়ে যে ফ্যান্টাসি আমরা দেখতে পাই—তার প্রতিফলন কিন্তু বাস্তবেও চোখে পড়ে। আমের তুল্য ফল বোধহয় সত্যিই হয় না। তাই আম ভালবাসেন না, এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া বিরল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যে কতটা আমভক্ত ছিলেন, সে কথা প্রায় সবারই জানা। অবশ্য শুধুমাত্র কবিগুরু নন, অনেক বিখ্যাত মানুষ-মনীষীদেরও প্রিয় ফল ছিল এই আম। কলকাতায় বসে আম খেতে ও খাওয়াতে ভালবাসতেন কবি হেমচন্দ্র, অধ্যাপক ললিতকুমার বাঁড়ুজ্যে, ঐতিহাসিক রাখালদাস বাঁড়ুজ্যে এবং আরও অনেকেই। স্বামী বিবেকানন্দ আমকে বলতেন, 'আঁব'। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, শ্রীশ্রী সারদা দেবীরও প্রিয় আম ছিল 'আলফনসো'। এমনকী ইতিহাস বলছে, মোগল সম্রাট বাবরের কাছে আম এতটাই প্রিয় ছিল যে, তিনি আমকে 'গোর-ই-হিন্দ' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। সুতরাং, এই গরমে আম খান আর খাওয়ান। আর সঙ্গে দোসর হিসাবে যদি থাকে কুলফি? উফ, তাহলে তো সোনায় সোহাগা! তাই তো পাস্তা-পিৎজার জমানায় নয়া আমদানি 'আম কুলফি'। দাম পড়বে পঁচিশ টাকা। আর কুলফির বাজারে যাঁরা

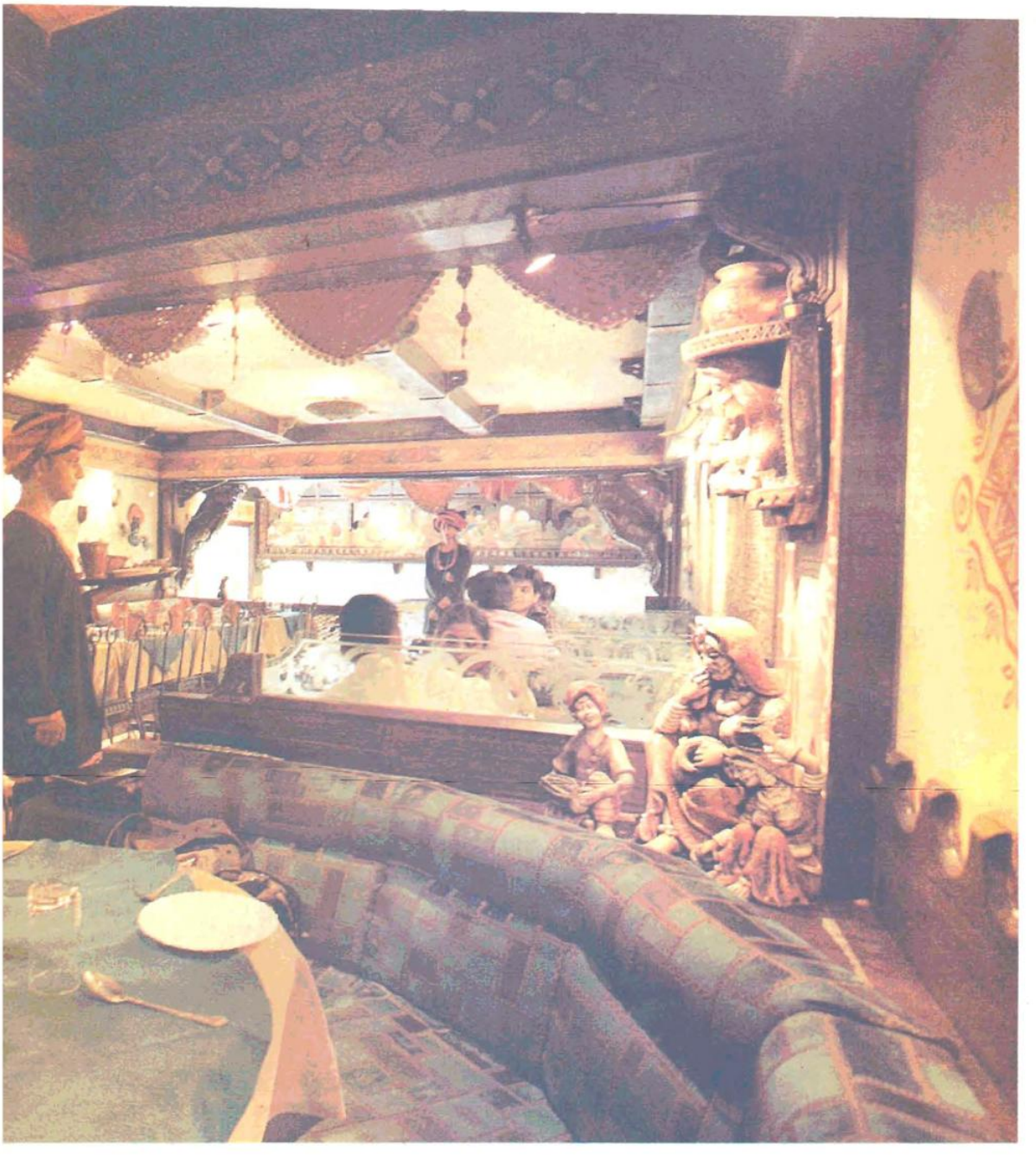

DUTTA FOOD PRODUCTS PVT. LTD. CITY OFFICE : AB 103, SECTOR 1, SALT LAKE, KOLKATA 700064, Ph 2359 4211/2321 9164

বিপ্লব ঘটিয়েছেন, তাঁরা হলেন পার্ক স্ট্রিটের 'গুপ্তা ব্রাদার্স'। অবশ্য শুধু নামেই আমের কুলফি—তা কিন্তু নয়। এ কুলফিতে পাবেন আস্ত একটি আম। আঁটি ছাড়া খাঁটি আমের শাঁসের ভিতরে সযত্নে লালিত কুলফিতে একেবারে ক্লিন বোল্ড আউট থেকে আশি। নয় নয় করে প্রায় কুড়ি বছর ধরে আমের মরশুমে একেবারে হট কেক-এর মতো বিকোচ্ছে এই আমের কুলফি।

প্রায় একশো কুড়ি বছর আগে চেতলায় গুপ্তা ব্রাদার্স-এর প্রথম আত্মপ্রকাশ। নিতান্ত শখের বশে শহর কলকাতার বুকে মিষ্টির দোকান দিয়েছিলেন মহাদেব প্রসাদ গুপ্তা। ভেবেছিলেন দেশে তো জমি-জমার ব্যবসা আছেই, সঙ্গে মিষ্টান্ন ব্যবসায় হাত পাকিয়ে যদি দু'পয়সা বাড়তি রোজগার হয়, তাহলে ক্ষতি কী? যেমন ভাবা তেমন কাজ। শুরু করলেন, তাঁদের প্রথম মিষ্টান্ন ব্যবসা। আর 'ভুতের রাজা'র বর পাওয়ার মতোই মিষ্টিপ্রেমীরা পেল গুপ্তা ব্রাদার্সকে। আস্তে আস্তে মিষ্টির পাশাপাশি পাওয়া যেতে লাগল বিভিন্নরকম নোনতা খাবার। প্লেন ধোকলা, পনির ধোকলা, নিমকি ও আরও কত কী! এরপর আসরে নামলেন, ছেলে রামচন্দ্র গুপ্তা। তাঁর উদ্যোগেই বালিগঞ্জ-এ খুলল গুপ্তা ব্রাদার্স-এর অপর শাখা। শুধু মিষ্টি নয়, পথচলতি আমজনতার খিদে মেটানোর তাগিদে আমদানি করলেন নয়া জমানার ফাস্ট ফুড। চাহিদা বাড়ল, বাড়ল জনপ্রিয়তা চড়চড় করে। তখন গুপ্তা ব্রাদার্স শুধুমাত্র আর কোনও মিষ্টির দোকান নয়। ভোল পাল্টে এই দোকান হল, পুরোদস্তুর রেস্তোরাঁ। যাবতীয় দায়দায়িত্ব বর্তাল রামচন্দ্র গুপ্তা-র পাঁচ সন্তানের কাঁধে। প্রকাশচন্দ্র গুপ্তা, গজেন্দ্রপ্রসাদ গুপ্তা, ললিত গুপ্তা, উমেশ গুপ্তা এবং রাজেশ গুপ্তা-রাই এগিয়ে নিয়ে চললেন তাঁদের পারিবারিক ব্যবসা। এরপর নিউ আলিপুর, এলগিন রোড, পার্ক স্ট্রিটেও খুলল গুপ্তা ব্রাদার্স-এর অন্যান্য শাখাগুলো। পার্ক স্ট্রিট শাখার হাল ধরলেন রাজেশ গুপ্তা। শুরু হল, গুপ্তা ব্রাদার্স-এর দ্বিতীয় ইনিংস।

বেস্ট কোয়ালিটি, ইনোভেশন, গুড টেস্ট, লো ক্যালোরি-লো ফ্যাট সমৃদ্ধ খাবার—গুপ্তা ব্রাদার্স-এর ইউএসপি বলে মনে করেন রাজেশ গুপ্তা। 'কোয়ালিটির প্রশ্নে কখনও আপোস করি না'—বললেন, গুপ্তা ব্রাদার্স-এর এই অন্যতম কর্ণধার। আর সেই কারণেই আম কুলফি বানানোর জন্য বেস্ট কোয়ালিটির আলফনসো আম (স্থানীয় নাম হাপসু) আনেন সুদূর মহারাষ্ট্র থেকে। এই আমের খোসা যেমন সুন্দর তেমনই তরতাজা থাকতে পারে প্রায় তিন সপ্তাহ মতন। সেইজন্য বিদেশে রপ্তানি করাও সহজ, এই আম। আর স্বাদবৈচিত্র্য? হলফ করে বলতে পারি, এ আমের কুলফি মুখে দিলে মনপ্রাণ তো ভরবেই—সঙ্গে ফুল ফর্মে ব্যাটিং করে মারকাটারি ওভার বাউন্ডারি হবেই হবে!

তবে ডেসার্ট-এর তালিকায় আম কুলফি ছাড়াও রয়েছে 'রোজ মালাই', 'ম্যাঙ্গো রসমালাই', 'লিচুর সন্দেশ'—আরও অনেককিছু। তার মধ্যে, 'আবার খাব' আর 'ছুপা রুস্তম' সবার একেবারে হট ফেভারিট। এছাড়াও অফিস আওয়ার্স-এর ফাঁকে টুক করে লাঞ্চ সেরে নিতে চাইলে নির্দ্বিধায় চলে আসতে পারেন পার্ক স্ট্রিটের এই শাখায়। পাপড়ি চাটের পাশাপাশি গুপ্তা ব্রাদার্স-এরই রেস্তোরাঁ 'ঝরোকা'-তে পাবেন উত্তর ভারতীয় নানা পদ। রয়েছে 'থালি ঘরওয়ালি' আর 'মিনি থালি'। ডাল মাখনি, পনির দম, মেথি পনির, করাই পনির, ক্রিসপি চিলি, হরি কারি, নান, বেবি কোর্ট-এর মতো জিভে জল আনা সব পদ পাবেন, এই 'থালি সিস্টেম'-এ। এছাড়াও বিভিন্ন অকেশন-এ প্রায়ই কোনও না কোনও ফুড ফেস্টিভ্যাল-এর আয়োজন করে থাকেন এঁরা। আমির খান-এর 'লগান টিম' যে বার কলকাতায় এসেছিল, সে বার ক্যাটারিং-এর দায়িত্ব ছিল এঁদের উপর। খাবার খেয়ে খুশি হয়ে আমির সহ গোটা 'লগান টিম' গুপ্তা ব্রাদার্স-এর হাতে তুলে দিয়েছিলেন ছবিতে ব্যবহৃত সেই বিখ্যাত ব্যাট!

তবে লোভনীয় এবং সুস্বাদু এইসব পদ-এর যাবতীয় সাফল্যের চাবিকাঠি কিন্তু মশলার ব্যবহার। আর এই মশলা তৈরি হয় গুপ্তাজি-দের বাড়িতেই। গুপ্তা ব্রাদার্স-এর গুপ্তকথা, মশলা তৈরির উপকরণ আর মিশেলের অনুপাত—একেবারেই ফাঁস করতে নারাজ দোকানের কর্মচারীদের কাছে। হরেক রকমের খাবার নিয়ে প্রতিনিয়ত এক্সপেরিমেন্ট করে চলেছেন এঁরা। আর সেই এক্সপেরিমেন্ট-এরই ফসল আম কুলফি। বাদশাহি স্বাদ, নবাবী মেজাজ যেন দেওয়ান-ই-আম।

দোকানে আঁটি বের করে আমের শাঁসের মধ্যে কুলফি পুরে বিক্রি করা হয়। কিন্তু বাড়িতে এইভাবে করা সহজ নয়, তাই কুলফির ছাঁচ ব্যবহার করলেই হবে।

দশ পিস আমের কুলফি করতে **লাগবে**

দুধ (ফুল ক্রিম)—২ লিটার
চিনি—১২০ গ্রাম
খোসাসমেত পেস্তা—৩ টেবিল চামচ, কুচনো
খোসাসমেত গোটা আমান্ড—৩ টেবিল চামচ
আম—৩ পিস
ম্যাঙ্গো পাল্প—৫ চা চামচ
কুলফির ছাঁচ—১০টা

এবার

প্রথমে একটা বড় ভারি পাত্রে দুধ ঢেলে বেশি আঁচে ফোটান আর নাড়তে থাকুন। কিছুক্ষণ পর হালকা আঁচে দুধটাকে নাড়তে থাকুন যতক্ষণ না এটা ঘন হয়ে অর্ধেক হচ্ছে। এরজন্য আপনার সময় লাগবে ৪০-৪৫ মিনিট। এবার দুধ ফোটানো হয়ে গেলে তাতে চিনি ঢেলে ভাল করে নাড়তে থাকুন। এরপর দুধটা ঠাণ্ডা হতে দিন।

এবার দু'টো আমের ছোট ছোট টুকরো করুন। আমের টুকরোগুলো থেকে রস বের করে ঘন দুধে মিশিয়ে দিন। এরসঙ্গে এবার ম্যাঙ্গো পাল্প মেশান। মিক্সিংটা যেন প্রপারলি হয়, সেদিকে খেয়াল রাখবেন।

এবার মিশ্রণটিকে কুলফির ছাঁচে ফেলুন। ছাঁচের মুখটা প্লাস্টিক র‍্যাপ বা ফয়েল দিয়ে মুড়ে, ছাঁচ সমেত আমের কুলফি ফ্রিজে রেখে দিন।

ছ'ঘণ্টা বাদে ফ্রিজ থেকে ছাঁচ বের করে তার থেকে কুলফিটা বের করে নিন। আড়াআড়ি ভাবে কুলফিকে তিন-চার টুকরোয় কেটে ডেসার্ট প্লেটে পরিবেশন করুন।

ছবি তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

Approach Roads & Bridges

Multi-product SEZ's

Several Small & Medium Scale Enterprises

Health, Education & Residential Developments

Over 17 lakh job opportunities

Coming Soon

NKID
NEW KOLKATA INTERNATIONAL DEVELOPMENT

A City of New Opportunities

For the growth and transformation of the economic and social landscape of West Bengal.

unitech
Dream. Believe. Create.

USE
UNIVERSAL SUCCESS

22, Camac Street, Block-A, 4th Floor, Kolkata - 700 016. India Ph: +91 33 2289 2000, 6450 2000 Fax: +91 33 2289 1530, +91 98319 53407
E-mail: kolkata@unitechgroup.com www.unitechgroup.com

লাইফটাইম*
মাত্র

Rs. 222

Smart Life Power

RELIANCE
Mobile

smart
Reliance GSM Service

*শর্তাবলী প্রযোজ্য। স্মার্ট লাইফ পাওয়ার-এ অ্যাক্টিভ থাকার জন্য, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চার্জেস্ ও সরকারী শুল্কের অতিরিক্ত, প্রতি 60 দিনে ন্যূনতম Rs. 75 ডিনোমিনেশনের রিচার্জ আর Rs. 75 মূল্যের ব্যবহার করা আবশ্যক।

Call 98830 98830 (Kolkata)
Call 98320 98320 (Bengal)